بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের আপত্তি সমূহের জবাব

প্রসঙ্গ-বহু বিবাহ

প্রশ্নঃ ইসলাম কেন একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়? অথবা ইসলামে বহু-বিবাহ অনুমোদিত কেন?

উত্তর ঃ ক. বহু বিবাহের সংজ্ঞা ঃ 'বহু-বিবাহ' হলো এমন একটি বিবাহ পদ্ধতি যেখানে একজন ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে। বহু-বিবাহ দুই ধরনের- একজন পুরুষ একাধিক নারীকে শাদি করে। আর একজন নারী বহু স্বামী বরণ করে। তবে ইসলামে পুরুষের জন্য সীমিত সংখ্যক 'বহু-বিবাহ' অনুমোদিত।

অন্য দিকে নারীর জন্য একাধিক পুরুষ বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এবার মূল প্রশ্নের আসা যাক। কেন একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি পায়?

খ.পৃথিবীতে আলকুরআনই একমাত্র ধর্ম- গ্রন্থযে বলে "বিবাহ করো মাত্র একজনকে" ঃ

পৃথিবীতে কুরআনই একমাত্র ধর্ম-গ্রন্থ যা এই ঘোষণা দেয়- "বিবাহ করো মাত্র একজনকে' অন্য ধর্ম-গ্রন্থ নেই, যা পুরুষকে নির্দেশ করে একজন স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকতে। আর অন্য সব ধর্ম-গ্রন্থ- হোক তা বেদ, রামায়ন, মহাভারত, গীতা, তালমুদ অথবা বাইবেল। এ সবের মধ্যে স্ত্রীদের সংখ্যার ওপর কোনো বিধিনিষেধ বের বা দেখাতে পারবে কী কেউ? বরং এসব ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী একজন পুরুষ বিবাহ করতে পারে- যতজন তার ইচ্ছা। যেমন রামের পিতা রাজা দশরথ একাধিক স্ত্রী গ্রহন করেছেন। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের তো অনেক স্ত্রী ছিল! এটা অনেক পরের কথা যে, হিন্দু ধর্ম গুরু এবং খ্রীষ্টান চার্চ স্ত্রীর সংখ্যা 'এক' এ বিধান করে দিয়েছে।

বাইবেলে যেহেতু স্ত্রীদের সংখ্যা নিরুপনে কোনো বিধিনিষেধই নেই। সেহেতু অতীতের খ্রীষ্টান পুরুষরা যে-ক'জন খুশি স্ত্রী রাখতে পারত। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে তাদের চার্চ বা পুরোহিতরা স্ত্রীর সংখ্যা 'এক' এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। ইহুদীদের ধর্মে বহু বিবাহ অনুমোদিত। তাদের তালমুদিয় বিধান অনুযায়ী আব্রাহামের [ইব্রাহীম (আ)] তিনজন স্ত্রী ছিল এবং সলোমনের (সুলাইমান (আ)-এর ছিল শতাধিক স্ত্রী। বহু-বিবাহের এই প্রথা চলে আসছিল তাদের "রাব্বাঈ" জারসম বিন ইয়াহুদাহ্ পর্যন্ত। (৯৬০ থেকে ১০৩০ সি.ই) তিনিই এর বিরুদ্ধে একটি ফরমান জারি করেন। ইহুদীদের 'সেফারডিক' সমাজ যারা প্রধানত মুসলিম দেশগুলোতে বসবাস করে তারা এই প্রথাকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত বলবৎ রাখে। অতঃপর ইসরাঈলের প্রধান রাব্বাঈ একাধিক স্ত্রী রাখার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে।

একটি লক্ষণীয় বিষয়

১৯৭৫ সালের আদম-শুমারী অনুযায়ী ভারতীয় হিন্দুরা বহু বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিমদের চাইতে অগ্রগামী ছিল। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত কমিটি অফ দি স্ট্যাটাস অফ ওমেন ইন ইসলাম (ইসলামে নারীর মর্যাদা কমিটি) বইয়ের

৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, একাধিক স্ত্রী-সংক্রান্ত বিবাহ হিন্দুদের মধ্যে শতকরা পাঁচ দশমিক শূন্য ছয় (৫.০৬%) আর মুসলমানদের মধ্যে চার দশমিক তিন এক (৪.৩১%)। ভারতীয় ল অনুযায়ী একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন কেবলমাত্র মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত। অন্য যেকোনো ভারতীয় অমুসলিমের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ। এটা অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের তুলনায় হিন্দুরাই একাধিক স্ত্রী বেশি রাখছে। এর পূর্বেতো কোনো বিধিনিষেধই ছিল না। এই তো সেদিন ১৯৫৮ সালে হিন্দু বিবাহ-বিধি অনুমোদিত হয়েছে এভাবে যে, একজন হিন্দুর জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অবৈধ। বর্তমানে তা ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আইন। যা "হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থের" আইন নয়।

আসুন এখন দেখা যাক ইসলাম কেন একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়।

গ. কুরআন একাধিক বিবাহের নিয়ন্ত্রিত রূপকে অনুমতি দেয়

আমি আগে যেমন বলেছি পৃথিবীতে কুরআনই একমাত্র ধর্মীয় গ্রন্থ ঘোষণা দিয়েছে 'বিবাহ করো মাত্র একজনকে'। কথাটি কুরআনের সূরা নিসার নিম্নবর্ণিত আয়াতের অংশ।

অর্থঃ বিবাহ করো তোমাদের পছন্দের নারী- দু'জন অথবা তিনজন অথবা চারজন কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তোমরা তাদের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করতে না-ও পারতে পারো– তাহলে মাত্র একজন। (৪ ঃ ৩)

কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে একাধিক-বিবাহের কোনো সীমা নির্ধারিত ছিল না এবং ক্ষমতাবান অধিকাংশ লোক এতে অভ্যস্ত ছিল। কেউ কেউ তো শ' পর্যন্ত মাত্রা না ছাড়ালে ক্ষান্ত হতো না। কুরআন সর্বোচ্চ চার জনের একটা সীমা নির্ধারণ করে দেয়। ইসলাম একজন পুরুষকে দুজন, তিনজন অথবা চারজনের যে অনুমতি দিয়েছে তা এই কঠিন শর্তের সাথে যে, শুধুমাত্র তখনই তা সম্ভব যখন তাদের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচারমূলক আচরণ করতে পারবে।

একই সূরার ১২৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে -

অর্থ, তুমি কখনোও পেরে উঠবে না স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে। (৪ঃ ১২৯)

কাজেই ইসলামে একাধিক বিবাহ কোনো বিধান নয় বরং ব্যতিক্রম। বহু লোক এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত যে, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা অত্যাবশ্যক।

বিবাহ করা না করার ক্ষেত্রে ইসলামে পাঁচটি শ্রেণী-বিন্যাস করা হয়েছে।

১. ফরজ –অবশ্য করণীয় বা বাধ্যতামূলক।

২. মুস্তাহাব – অনুমোদিত উৎসাহিত।

৩. মুবাহ – অনুমোদনযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য।

৪. মাকরূহ – অনুমোদিত নয় বা নিরুৎসাহিত।

৫. হারাম– বে-আইনী বা নিষিদ্ধ।

এর মধ্যে বহু-বিবাহ মধ্যম পন্থায় পড়ে। অর্থাৎ অনুমোদন যোগ্য এবং কোনোভাবে, কথা বলা যাবে না যে, একজন মুসলিম, যার দুজন, তিনজন অথবা চারজন স্ত্রী রয়েছে, সে তার তুলনায় ভালো মুসলিম যার স্ত্রী মাত্র একজন।

গড় আয়ুষ্কাল পুরুষের তুলনায় নারীর বেশি

প্রাকৃতিকভাবে নারী ও পুরুষের জন্মহার প্রায় সমান। একজন মেয়ে শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছেলে শিশুর চাইতে বেশি। একজন মেয়ে শিশু রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে পুরুষ শিশুর চাইতে বেশি লড়াই করতে সক্ষম। এ কারণে শিশু বয়সে নারীর অপেক্ষায় পুরুষের মৃত্যু হার বেশি।

দেখা যায়, যে কোনো যুদ্ধের সময় নারীর তুলনায় পুরুষের বেশি মৃত্যু হয়। সাধারণ দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যাধিতে নারীর তুলনায় পুরুষ বেশি মারা যায়। তাই গড় আয়ুষ্কাল পুরুষের চাইতে নারীর বেশি। অতিতের যে কোনো যুগে ফিরে দেখলে দেখা যাবে– বিপত্নীকের চাইতে বিধবার পরিমাণ বেশি।

ভারতে পুরুষের জন্ম-হার নারীর তুলনায় বেশি। কারণ নারী শিশুর ভ্রূণ-হত্যা ও নারী শিশু হত্যা

প্রতিবেশি কয়েকটি দেশের মধ্যে তুলনামূলকভাবে ভারতীয় পুরুষ- জনসংখ্যা নারী জনসংখ্যা অপেক্ষা বেশি। এর নেপথ্য কারণ হলো অতিমাত্রায় নারী শিশু হত্যা। প্রতি বছর নূন্যতম দশলাখ 'নারী-ভ্রূণের' গর্ভপাত ঘটানো হয় যখনই মায়ের গর্ভে তাকে নারী হিসাবে সনাক্ত করা যায়। যদি এই অভিশপ্ত কর্ম বন্ধ করা যায় তাহলে ভারতেও পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে।

বিশ্বব্যাপী নারী জনসংখ্যা পুরুষের চাইতে বেশি

আমেরিকায় পুরুষের চেয়ে ৭০,৮০,০০০ নারী বেশি। শুধু নিউইর্য়ক সিটিতে পুরুষের চেয়ে দশলাখ নারী বেশি। উপরন্তু নিউইয়র্কের এক তৃতীয়াংশ পুরুষ সমকামী। অর্থাৎ তারা কোনো নারী-সঙ্গ বা বিবাহ করতে আদৌ আগ্রহী নয়। ইংল্যান্ডে পুরুষ জনসংখ্যা অপেক্ষা চল্লিশ লক্ষ নারী বেশি। একইভাবে জার্মানীতে পঞ্চাশ লাখ অতিরিক্ত নারী। রাশিয়াতে নব্বই লাখ। এরপর একমাত্র আল্লাহ্‌ই ভাল বলতে পারেন সমগ্র পৃথিবীতে একজন পুরুষের বিপরীতে একজন নারী ধরে নেয়ার পর কত নারী অতিরিক্ত থেকে যাবে।

প্রত্যেক পুরুষের জন্য একজন স্ত্রী এই নিয়ন্ত্রণ বাস্তবতা বিবর্জিত

আমেরিকার প্রতিটি পুরুষ যদি একজন করে মহিলাকে বিবাহ করে তারপরেও তিন কোটির বেশি এমন নারী থেকে যাবে, যারা নিজেদের জন্য কোনো স্বামী পাবে না। উপরন্তু গোটা আমেরিকায় সমকামী পুরুষের সংখ্যা দুই কোটি পঞ্চাশ লাখের বেশি। অনুরূপ চল্লিশ লাখের বেশি নারী ইংল্যান্ডে। পঞ্চাশ লাখের মত জার্মানিতে এবং প্রায় এক কোটি নারী রাশিয়াতে– যারা কোনো স্বামী পাবে না।

ধরা যাক, আমার বোন অথবা আপনার বোন আমেরিকা নিবাসী একজন অবিবাহিতা মহিলা সেখানে তার জন্য দুটি পথ খোলা আছে– হয়তো সে এমন একজন পুরুষকে বিবাহ করবে যার একজন স্ত্রী রয়েছে অথবা তাকে হতে হবে "জনগণের সম্পত্তি"– বিকল্প কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। তবে যারা রুচিশীলা তারা প্রথমটাই বেছে নেবে। অধিকাংশ নারী অপর নারীর সঙ্গে তার স্বামীকে ভাগাভাগি করতে রাজি হয় না। কিন্তু ইসলামে পরিস্থিতি বিবেচনায় তা-ই জরুরী হয়ে ওঠে– "মুসলিম নারী তার সঠিক ঈমানের কারণে এই সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে অনেক বড় ক্ষতি হতে রক্ষা করে তার আর এক মুসলিম বোনকে জনসাধারনের সম্পত্তি হওয়ার হাত থেকে হেফাযত করতে পারেন"।

জনসাধারণের সম্পত্তি হওয়ার চেয়ে একজন বিবাহিত পুরুষ বিয়ে করা শ্রেয় ঃ

পশ্চিমা সমাজে একজন পুরুষের 'মেয়ে-বন্ধু' খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। অথবা একাধিক বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্ক। এক্ষেত্রে নারীরা মর্যাদাহীন ও অনিশ্চিত-অরক্ষিত জীবন যাপন করে। অথচ সেই একই সমাজ একজন

পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রীগ্রহণ করতে রাজি নয়। যেখানে নারী হতে পারতো একজন সম্মানিতা, মর্যাদাময় আসনের অধিকারিণী এবং যাপন করতো নিরাপত্তাপূর্ণ নিরাপদ জীবন।

যেখানে নারীর সম্মুখে মাত্র দুটি পথ খোলা। যে স্বাভাবিকভাবে কোনো স্বামী পাবে না। তাকে হয় একজন বিবাহিত পুরুষকেই বিয়ে করতে হবে নতুবা হতে হবে জনগণের সম্পত্তি। ইসলাম পছন্দ করে নারীকে সম্মানজনক অবস্থান দিতে, তাই ইসলাম প্রথম পথের অনুমোদন দেয় এবং ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে দ্বিতীয়টিকে।

আরো কিছু কারণ রয়েছে যে সবের জন্য ইসলাম নিয়ন্ত্রিত বহু-বিবাহ অনুমোদন করেছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নারীর সম্মান-মর্যাদা ও সম্ভ্রম সুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখে।

একাধিক স্বামী

প্রশ্নঃ একজন পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি পায়, তাহলে ইসলাম কেন একজন নারীকে একাধিক স্বামী রাখতে নিষেধ করে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বহুলোক যার মধ্যে মুসলমানও রয়েছে, প্রশ্ন করেন– মুসলিম পুরুষ একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি পাচ্ছে অথচ নারীর ক্ষেত্রে সে অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে, এর যৌক্তিকতা কী? অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে যে কথাটি প্রথমেই আমাকে বলে নিতে হবে, তা হলো ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়বিচার ও সমতার ভিত্তির ওপরেই ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত। মানুষ হিসেবে মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষকে সমান মর্যাদা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে সামর্থ ও যোগ্যতার ভিন্নতা এবং সে অনুযায়ী দায়িত্ব কর্তব্যের বিভিন্নতা দিয়েছেন। শারিরীক ও মানসিক দিক দিয়ে নারী ও পুরুষ সম্পূর্ণ আলাদা। জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব-কর্তব্যও বিভিন্ন। ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু একই রকম নয়।

আল কোরআনের সূরায়ে নিসার ২২-২৪ আয়াতে একটি তালিকা দেয়া হয়েছে যে, মুসলিম পুরুষ কোন কোন নারীকে বিবাহ করতে পারবে না। এরপরে ২৪নং আয়াতে পৃথকভাবে বলা হয়েছে সেই সব নারীও (নিষিদ্ধ) যারা অন্যের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ আছে। ইসলামে নারীর জন্য একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ কেন, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো তা পরিষ্কার করে দেবে।

একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার ঔরশে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মাতা-পিতার পরিচয় খুব সহজেই পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে, এজন নারী যদি একাধিক স্বামী গ্রহণ করে তবে এ পরিবারে জন্মিত শিশুর মায়ের পরিচয় পাওয়া যাবে– বাবার নয়। বাবা ও মায়ের সুস্পষ্ট পরিচয়ের ক্ষেত্রে ইসলাম আপোষহীন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানিদের মতে, যে শিশু তার মা-বাবার পরিচয় জানে না, বিশেষ করে বাবার– সে শিশু তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও হীনমন্যতায় ভোগে। এ সব শিশুদের শৈশব নিকৃষ্টতর এবং আনন্দহীন কাটে। দেহপসারিণীদের সন্তানরা এর জলন্ত প্রমাণ। স্বামী গ্রহণকারী পরিবারে জন্ম নেয়া শিশুকে কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে গেলে যদি মাকে প্রশ্ন করা হয় শিশুর পিতার নাম কী? তা হলে সে মাকে দু'জন অথবা অত্যধিক পুরুষের নাম বলতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতিতে এখন জেনেটিক পরীক্ষার দ্বারা মা ও বাবা উভয়কে সনাক্ত করার কৌশল আবিষ্কার করেছে। কাজেই যে বিষয়টা অতীতে অসম্ভব ছিল সম্প্রতি তা খুব সহজেই হতে পারে।

প্রকৃতিগত যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট, বহুগামীতায় নারীর চেয়ে পুরুষের বেশি। শারীরিক যোগ্যতায় একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রীর স্বামীর দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করা সহজ। অপরদিকে একজন নারী কয়েকজন স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। মাসিক ঋতুচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে মানসিক ও আচরণগত বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যে তাকে ঘুরপাকে পড়তে হয়।

একজন নারী যার একাধিক স্বামী থাকবে– তাকে তো একই সঙ্গে কয়েকজনের যৌন-সঙ্গী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সমূহ সম্ভাবনা থাকে যৌন রোগের এবং যৌনতার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ার। ফলে তার মাধ্যমেই সে সব রোগে তার স্বামীরা আক্রান্ত হবে। পক্ষান্তরে একজন পুরুষ- যার একাধিক স্ত্রী, স্ত্রীদের মধ্যে কারো যদি পরকিয়ায় যৌন সম্পর্ক না থাকে তাহলে যৌনতা সংক্রান্ত কোনো রোগে আক্রান্ত হবার আদৌ কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

উপরোক্ত কারণগুলো এমন যা যে কারো পক্ষে জানা এবং বোঝে নেয়া সম্ভব। এছাড়া হয়তো আরো বহু কারণ থাকতে পারে যে কারণে অনন্ত জ্ঞানের আধার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা নারীদের জন্য বহু স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন।

ইসলাম কী তলোয়ারের দ্বারা প্রসারিত হয়েছে?

প্রশ্নঃ ইসলামকে কিভাবে শান্তির ধর্ম বলা যাবে অথচ তা প্রচার ও প্রসার হয়েছে তলোয়ার দ্বারা?

ডা. জাকির নায়েক ঃ কতিপয় অমুসলিমের এটা একটা সাধারণ অভিযোগ যে, সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী ইসলাম এত কোটি কোটি অনুসারী পেতে পারতো না, যদি না তা–শক্তি প্রয়োগে প্রসারিত হতো। নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো পরিষ্কার করে দেবে, যা তলোয়ারের মাধ্যমে প্রসারের অভিযোগ খণ্ডন করে দিবে। তা ছিল সত্যের সহজাত শক্তি, সঙ্গত কারণ ও মানব প্রকৃতি সম্মত যৌক্তিকতা যা এত দ্রুত ইসলামের প্রচার ও প্রসারের বাহন বা সহায়ক হয়েছে।

ক. ইসলাম মানে শান্তি

ইসলাম এসেছে 'সালাম' শব্দ থেকে। এর অর্থ শান্তি। এর আরো একটি অর্থ হচ্ছে নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা–শক্তিকে আল্লাহ্র প্রতি সমর্পিত করা। এভাবে ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম, যা লাভ করা যায় সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছাকে আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে সমর্পিত করে দিলে।

খ. শান্তি বজায় রাখতে কখনো কখনো শক্তি প্রয়োগ করতে হয়

পৃথিবীর প্রতিটি লোক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুকূলে নয়। এমন মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে এর বিঘ্ন ঘটায়। সকল ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশে অপরাধী ও সমাজ বিরোধীদের দমন করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে। যাদেরকে আমরা 'পুলিশ' বলি। ইসলাম শান্তির প্রবর্তক। একই সাথে তার অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করে জুলুম, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে জালিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কখনো কখনো শক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ইসলাম শুধু মাত্র মানুষের সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়।

গ. ঐতিহাসিক ডি ল্যাসী ওলেরীর মন্তব্য

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক ডি ল্যাসী ওলেরী' প্রণীত "ইসলাম অ্যাট দা ক্রস রোড" গ্রন্থে যে মন্তব্য তিনি করেছেন তাতে "তরবারীর সাহায্যে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে" এই ভ্রান্ত ধারণায় যারা নিমজ্জিত– তাদের জন্য দাঁত ভাঙ্গা জবাব।

"অবশেষে ইতিহাসই একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, 'ধর্মান্ধ মুসলমানদের কাহিনী হলো, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তারা তাড়া করে বেরিয়েছে আর বিজিত জাতিদেরকে তরবারীর অগ্রভাগে রেখে

ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছে'। এটা অনেকগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কল্পনাপ্রসূত, উদ্ভট ও অবাস্তব কাহিনী– যা ঐতিহাসিকরা বেশি বেশি পুনরাবৃত্তি করেছেন"।

ঘ. মুসলমানরা দীর্ঘ আটশত বছর স্পেন শাসন করেছে

প্রায় আট'শ বছর স্পেন শাসন করেছে মুসলমান জাতি। সেখানে মানুষকে 'তরবারীর শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করেছে'– এমন কথা চির শত্রুও বলতে লজ্জা পাবে। আর খ্রীষ্টান ক্রুসেডাররা স্পেনে এসে সেই মুসলমানদেরকেই নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ফলে এমন একজন মুসলান স্পেনে ছিল না যে তার নামাযের জন্য প্রকাশ্যে আযান দিতে পারত।

ঙ. ১৪ মিলিয়ন আরব 'মিশরীয়' খ্রীস্টান

সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ১৪০০ বছর মুসলমানরাই ছিল মালিক, মনিব, শাসক। এর মধ্যে সামান্য কিছু বছর ব্রিটিশ এবং আর কয়েক বছর ফরাসীরা দখলদারিত্ব করেছিল। সর্বোপরি মুসলিমরাই ১৪০০ বছর আরব শাসন করে আসছে। তারপর আজও সেখানে ১৪ মিলিয়ন খ্রীস্টান বংশ পরম্পরায় কিভাবে রইল? মুসলমানরা যদি তরবারী ব্যবহার করত তাহলে একজন খ্রীষ্টানও কী সেখানে এখন খুঁজে পাওয়ার কথা?

চ. ভারতে ৮০% এর বেশি অমুসলিম

মুসলমানরা ভারত শাসন করেছে একটানা প্রায় আটশ বছর। যদি তারা ইচ্ছা করতো তাহলে তাদের সেই রাজ-শক্তি ও ক্ষমতার বল প্রয়োগ করে ভারতের প্রতিটি অমুসলিমকে ধর্মান্তরিত বানাতে পারত। অথচ শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি অমুসলিম আজো ভারতেই আছে। তাদের প্রতিটি অমুসলিম আজ একথা সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে যে, "ইসলাম তরবারীর সাহায্যে প্রসারিত হয়নি।"

ছ. ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া

ইন্দোনেশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ-সংখ্যক মুসলমান বাস করে আর মালয়েশিয়ার জনসংখ্যার অধিকাংশ মুসলমান। কেউ একজন প্রশ্ন করতে পারে, কোন মুসলিম সেনাবাহিনী সেখানে গিয়েছিল?

জ. আফ্রিকার পূর্বপ্রান্ত

একই ভাবে ইসলাম দ্রুতগতিতে আফ্রিকার পূর্বতীরে বিকাশ লাভ করে আবারো কেউ একজন প্রশ্ন করতে পারে, ইসলাম যদি তরবারীর অগ্রভাগ দিয়েই প্রসারিত হয়ে থাকে তাহলে আফ্রিকার পূর্বতীরে মুসলিমদের কোন বাহিনী তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল?

ঝ. থমাস কারলাইল

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক থমাস কারলাইল তার প্রণীত 'হিরোয এন্ড হিরো ওরশিপ' গ্রন্থে ইসলামের বিকশিত হওয়া নিয়ে যে ভ্রান্ত ধারণা যে সম্পর্কে বলেছেন –

"তরবারী, কিন্তু কোথায় পাবে তুমি তোমার তরবারী? প্রত্যেকটি নতুন 'মত' তার প্রারম্ভে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হয়– একজনের সংখ্যালঘুত্বে। শুধু একজন মানুষের মাথায়। সেখানেই তা থাকে। সারা পৃথিবীর শুধু একজন মানুষ তা বিশ্বাস করে, অর্থাৎ সকল মানুষের বিপক্ষে শুধু একজন মানুষ। একটি তরবারী সে নিল এবং তা দিয়ে তা (তার মতাদর্শ) প্রচার করতে চেষ্টা করল। তাতে তার কোনো কাজ হবে কী? তোমার তরবারী তোমাকেই খুঁজে নিতে হবে! মোট কথা একটি জিনিস আপনা আপনি বিকশিত হবে যেমনটা তার ক্ষমতা আছে।"

ঙ. দ্বীন নিয়ে কোনো জবরদস্তি নেই

কোন তরবারী দ্বারা ইসলাম বিকশিত হয়েছে? এমনকি সে তরবারী যদি মুসলমানদের হাতেও থাকতো তাহলেও তারা তা ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে পারত না, কারণ তাদের পথের দিশা আল কুরআন বলছে ঃ لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ج قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۔

অর্থঃ দ্বীন নিয়ে কোনো জবরদস্তি বা জোরাজুরি নেই। সকল ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে সত্য-পথ স্পষ্ট করে দেয়া আছে। (২ ঃ ২৫৬)

ট. জ্ঞান ও প্রজ্ঞার তরবারী

তা ছিল চেতনা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার তরবারী, যে তরবারী মানুষের হৃদয় মন ও অন্তরকে জয় করেছে। কুরআনের সূরা নাহলে ইরশাদ হয়েছে –

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۔

অর্থঃ আহবান করো সকলকে তোমার প্রতিপালকের পথে– প্রজ্ঞাপূর্ণ সুন্দরতম বাগ্মীতার সাথে। আর যুক্তি প্রমাণ দ্বারা আলোচনা করো তাদের সাথে এমনভাবে, যা সর্বোত্তম। (১৬ ঃ ১২৫)

ঠ. ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত পৃথিবীতে ধর্ম সমূহের বর্ধিষ্ণুতা

১৯৮৬ সালের রীডার্স ডাইজেস্টের 'এ্যালমানাক' সংখ্যার একটি তথ্য সমৃদ্ধ প্রবন্ধে– বিগত অর্ধ শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের বর্ধিষ্ণুতার হার সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি "প্লেইন ট্রুথ" ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়। সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে ইসলাম– যা বেড়েছে ২৩৫% হারে। আর খ্রীস্টবাদ বেড়েছে মাত্র ৪৭% হারে। এখানে একজন প্রশ্ন করতে পারে, মুসলমানরা কোন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এই শতাব্দীতে যা কোটি কোটি আদম সন্তানকে ধর্মান্তরীত করে মুসলমান বানিয়েছিল?

ঢ. আমেরিকা ও ইউরোপ দ্রুততম বর্ধিষ্ণু ধর্ম 'ইসলাম'

সম্প্রতি আমেরিকায় দ্রুততম বর্ধিষ্ণু ধর্ম হচ্ছে 'ইসলাম'। মুসলমানের সংখ্যা দ্রুততার সাথে বেড়েই চলেছে ইউরোপেও। শক্তি ও বিকশিত সভ্যতার অহংকার ভূৎ হয়ে থাকা পাশ্চাত্য সভ্যতার এই সব সু-সভ্য মানুষকে এত বিরাট সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করতে কোন তরবারী বাধ্য করছে?

ডা. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ারসন

ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ারসন বলেছেন, যারা আশঙ্কা করছে পারমানবিক বোমা কোনো একদিন আরবদের হাতে এসে পড়বে। তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে, ইসলামী বোমা ইতিমধ্যেই ফেলে দেয়া হয়েছে। তা পড়েছে সেদিন– যেদিন 'মুহাম্মাদ (স) ভূপৃষ্ঠে জন্ম নিয়েছিলেন।

'হিজাব' বা নারীর পর্দা

প্রশ্ন ঃ ইসলাম পর্দার অন্তরালে রেখে নারীদেরকে কেন অবমূল্যায়ন করেছে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ইসলামে নারীর মর্যাদা'–বিধর্মী প্রচার মাধ্যমগুলোর একটা উপর্যপরি আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু– 'হিজাব' তথা ইসলামী পোশাক। ইসলামী বিধি বিধানে নারী নিগ্রহের সবচাইতে বড় হাতিয়ার হিসেবে যা কথায় কথায় দেখানো হয়। ধর্মীয়ভাবে নারীর জন্য রক্ষণশীল পোশাক বা পর্দা ফরয করার নেপথ্য কারণগুলো

আলোচনার পূর্বে ইসলাম আগমনের প্রাক বিশ্বসমাজে সামগ্রীকভাবে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কি ছিল তা নিয়ে সমসামান্য পর্যালোচনা প্রয়োজন।

ক. ইসলাম- পূর্ব যুগে নারীর-মর্যাদা বলতে কোনো ধারণার অস্তিত্ব ছিল না। তারা ব্যবহৃত হতো ভোগ্য সামগ্রী পন্য হিসেবে।

নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো বিশ্ব-ইতিহাস থেকে তুলে আনা হয়েছে। পর্যালোচনার মাধ্যমে যে চিত্র আমাদের চোখের সামনে উঠে আসবে তাতে আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাবো ইসলাম-পূর্ব সভ্যতাগুলোতে নারীর 'মর্যাদা' বলতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না। হীন নীচ এমনকি নূন্যতম 'মানুষ' হিসেবেও তারা ধর্তব্য ছিল না।

১. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ঃ ব্যাবিলনীয় আইনে নারীর কোনো ধরনের অধিকার স্বীকৃত ছিল না। মর্যাদা কী ছিল একটি উদাহরণে তা স্পষ্ট করে দেবে। কোনো পুরুষ যদি ঘটনাক্রমে কোনো নারীকে হত্যা করত তাহলে তাকে শাস্তি দেবার পরিবর্তে তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

২. গ্রীক সভ্যতা ঃ গ্রীক সভ্যতাকে প্রাচীনকালের সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম ও উজ্জ্বলতম সভ্যতা বলা হয়। তথাকথিত এই উজ্জ্বলতম সভ্যতায় নারী ছিল সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত। গ্রীকরা এক কাল্পনীক নারী যার নাম "প্যানডোরা" বিশ্ব মানবতার সকল দুর্ভাগ্যের মূল কারণ মনে করা হতো সেই নারীকে। তাই গ্রীকরা নারীকে 'প্রায় মানুষ' তথা মানুষের মতো বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষ নয় বলে মনে করত। পুরুষের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না। অন্যদিকে নারীর সতীত্ব ছিল মহামূল্যবান বস্তু এবং দেবীর মতো সম্মানও করা হতো। কিছুকাল পরেই এই গ্রীকরা আত্মঅহংকারের উত্তুঙ্গে উঠে ধরাপড়ে বিকৃত যৌনাচারের হাতে, বেশ্যালয়ে গমন সমাজের সকল মানুষের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল।

৩. রোমান সভ্যতাঃ রোমান সভ্যতা যখন তার বিকাশের শীর্ষ চূড়ায় তখন একজন পুরুষ যে-কোনো সময় তার স্ত্রীকে হত্যা করার অধিকার রাখতো। নগ্ন নারী যে-কোনো অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বেশ্যালয়ে যাতায়াত পুরুষের সংস্কৃতি ছিল।

৪. মিসরীয় সভ্যতাঃ মিসরীয় সভ্যতায় নারী 'ডাইনী' এবং শয়তানের নিদর্শন হিসেবে গণ্য হতো।

৫. ইসলামপ্রাক আরব ঃ ইসলাম পূর্ব আরব সমাজে নারীর অবস্থান ছিল ঘরের অন্যান্য ব্যাবহারিক আসবাবপত্রের মতো। অনেক পিতা অসম্মানের হেতু হিসেবে তার শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দিত।

খ. ইসলাম নারীকে উচ্চাসন ও সমতা দিয়েছে এবং প্রত্যাশা করে– তারা তাদের মর্যাদা রক্ষা করবে।

ইসলাম নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে এবং নিশ্চিত করেছে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে। ইসলামই নারীর মর্যাদা সংরক্ষণকারী।

পুরুষের পর্দা ঃ মানুষ সাধারণত পর্দা নিয়ে আলোচনা করে নারীদের ক্ষেত্রে। অথচ কুরআনে মহান আল্লাহ নারীর পর্দার আগে পুরুষের পর্দার কথা বলেছেন। সূরা নূরে বলা হয়েছে–

অর্থ, বলুন! ঈমানদার পুরুষদেরকে– তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের শালীনতা হেফাযত করে। এটা তাদেরকে আরো পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে তুলবে, আর আল্লাহ কিন্তু সব কিছুই জানেন যা তোমরা করো। (২৪ঃ৩০)

যে মুহূর্তে কোনো পুরুষ একজন নারীর দিকে তাকাবে– অশ্লীল চিন্তা তার মনে এসে যেতে পারে। কাজেই তার দৃষ্টি অবনত রাখাই তার জন্য মঙ্গলজনক।

নারীর জন্য পর্দা ঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- হে নবী বলুন, ঈমানদার নারীদেরকে– তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানসমূহের সংরক্ষণ করে এবং তাদের দৈহিক সৌন্দর্য ও অলংকারের প্রদর্শনী না করে। তবে অনিবার্যভাবে যা খোলা থাকে। তারা যেন তাদের বক্ষের ওপরে চাদর ঝুলিয়ে দেয় এবং প্রদর্শন না করে তাদের সৌন্দর্য, তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের স্বামীর পিতা এবং সন্তানদের ব্যতীত। (২৪ঃ৩১)

গ. হিজাবের ৬টি শর্ত ঃ

কুরআন ও সুন্নাহর বিধানমতে হিজাব পালনের ছয়টি শর্ত রয়েছে তা নিম্নরূপ।

১. পরিমাণঃ প্রথম শর্ত হলো দেহের সীমানা যা যতটুকু– অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে। নারী ও পুরুষের জন্য এটা ভিন্ন ভিন্ন। পুরুষের জন্য ঢেকে রাখার বাধ্যতামূলক পরিসীমা তার শরীরের নূন্যতম নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নারীর জন্য এই পরিসীমা আরো বিস্তৃত– হাত এবং মুখমন্ডল ছাড়া বাদবাকি শরীরের সমস্ত অংশ ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক। তারা যদি চায় তাহলে তা-ও আবৃত করে নিতে পারে। ইসলামের বিশেষজ্ঞ আলেমগণের অনেকেই হাত ও মুখমণ্ডলকেও বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখার অংশ মনে করেন। বাদবাকি পাঁচটি শর্ত নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই রকম প্রযোজ্য।

২. পরিধেয় পোষাক ঢিলেঢালা হতে হবে। যেন শরীরের মূল কাঠামো প্রকাশ না পায়।

৩. পরিধেয় কাপড় এতটা পাতলা ও স্বচ্ছ না হওয়া যাতে ভেতরটা দেখা যায়।

৪. পোশাক এতটা আকর্ষণীয় ও জাকজমকপূর্ণ না হওয়া, যাতে বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষিত হয়।

৫. পোষাক এমন হতে পারবে না যা বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের ন্যায় বা সমরূপ।

৬. পোশাক এমন হতে পারবে না যা দেখতে অবিশ্বাসীদের ন্যায়। তাই তাদের এমন কোনো পোষাক আষাক পরা উচিৎ নয় বা বিশেষভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের পরিচিত এবং চিহ্নিত (যারা মূলত অবিশ্বাসী)।

ঘ. অন্যান্য জিনিসের মধ্যে অঙ্গভঙ্গি ও হিজাবের অন্তর্ভুক্ত

উক্ত ছয় ধরনের পরিচ্ছদের পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ পর্দা ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, অভিব্যক্তি এবং লক্ষ উদ্দেশ্যকেও একিভূত করে। একজন লোক সে যদি কেবল কাপড়-চোপড়ে হিজাব পালন করে তাহলে সে 'হিজাব' পালন করল ন্যূনতম পর্যায়ের। পোশাকের পর্দা পালনের সাথে সাথে চোখের পর্দা, মনের পর্দা চিন্তা-ভাবনার পর্দা এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পর্দাও থাকা বাঞ্ছনীয়। পর্দার আওতার মধ্যে আরো যা পড়ে, তা হলো– ব্যক্তির চলা, কথা বলা এবং তার সার্বিক আচরণ ইত্যাদি।

ঙ. হিজাব বা পর্দা অহেতুক উৎপীড়ন প্রতিরোধ করে ঃ

নারীকে কেন পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে কুরআন তা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। সূরা আহ্যাবে ইরশাদ হয়েছেঃ

অর্থ, হে নবী! বলুন আপনার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে এবং ঈমানদার নারীদেরকে যে, তারা যেন তাদের বহিরাবরণ পরে থাকে (যখন বাইরে যাবে)। এটা তাদের পরিচিতির অত্যন্ত উপযোগী। (তারা যেন পরিচিত হয় বিশ্বাসী-নারী হিসাবে) তাহলে আর অহেতুক উৎপিড়ীত হবে না। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল দয়াবান। (৩৩ঃ৫৯)

কুরআন বলছেঃ নারীকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে এই জন্য যে, তারা যেন রুচিশীলা পরিচ্ছন্ন নারী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এবং এটা তাদেরকে লজ্জাকর উৎপীড়নের হাত থেকে হেফাজত করবে।

ট. দু'টি জমজ বোনের দৃষ্টান্ত

ধরা যাক জমজ দু'বোন। উভয়ই অপরূপ সুন্দরী। ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজনের পরিধেয় ইসলামী হিজাব। তথা সম্পূর্ণ দেহ আবৃত। শুধু কব্জী পর্যন্ত হাত ও মুখমণ্ডল খোলা। অন্য জন পরিধেয় পশ্চিমা পোশাক। শরীরের অধিকাংশ খোলা এবং প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ। সামনেই এক মোড়ে আড্ডা দিচ্ছে এক দল যুবক। মেয়েদেরকে দেখে হৈ- হল্লা করা, শীশ দেয়া ও উক্ত্যক্ত করাই তাদের কাজ। এখন বলুন এই দুই বোনকে যেতে দেখে তারা কাকে উদ্দেশ্য করে হল্লা করবে? শীশ দেবে? যে মেয়েটি নিজেকে ঢেকে রেখেছে তাকে দেখে, না যে মেয়েটি প্রায় উদোম তাকে দেখে? খুব স্বাভাবিকভাবেই তাদের দৃষ্টি যাবে যে নিজেকে দেখাতে চায় তার দিকে। কার্যত এ ধরনের পোশাক বিপরীত লিঙ্গের প্রতি 'বাকহীন নিরব আমন্ত্রণ'। যদ্দরুন বিপরীত লিঙ্গ উত্তেজিত হতে বাধ্য হয়। এ সম্পর্কে কুরআন যথার্থই বলেছে– 'হিজাব নারীদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করে'।

ছ. ধর্ষকের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড

ইসলামের বিধান মতে একজন পুরুষ যদি কোনো নারী ধর্ষণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তার শাস্তি প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড। অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেন এই কঠিন বাক্য শুনে। কেউ কেউ তো বলেই ফেলেন, ইসলাম অত্যন্ত নিষ্ঠুর, বর্বরদের ধর্ম। শত শত অমুসলিম পুরুষের নিকট আন্তরিকভাবে জানতে চেয়েছি– ধরুন, আল্লাহ না করুন কেউ একজন আপনার স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে অথবা আপনার বোন বা কন্যা। অতঃপর আপনাকে বিচারকের আসনে বসানো হয়েছে এবং ধর্ষককে আপনার সামনে হাজির করা হয়েছে। কী শাস্তি দেবেন তাকে? প্রত্যেকের উত্তর একটিই– "মৃত্যুদণ্ড"। কেউ বলেছেন, ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে আমার চোখের সামনে ব্রাশ ফায়ার করে ঝাঝরা করে দিবে। কেউ বলেছেন ওকে তিল তিল করে মৃত্যুর স্বাদ দিয়ে দিয়ে হত্যা করতে বলব। এই উত্তর দাতাদের কাছেই এখন আমার প্রশ্ন, আপনার মা-বোন স্ত্রী কন্যাকে কেউ ধর্ষণ করলে তাকে ওভাবে হত্যা করে ফেলতে চান। কিন্তু এই একই অপরাধ যদি অন্য কারো স্ত্রী-কন্যার ওপর ঘটে তখন আপনি নিজেই বলেন মৃত্যুদণ্ড অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুর হয়েছে। কেন ভাই, একই অপরাধের জন্য ক্ষেত্রভেদে দুই ধরনের দণ্ড?

জ. নারীকে মর্যাদা দেয়ারপশ্চিমা সমাজের দাবি কৌশলগত মিথ্যাচার

নারী স্বাধীনতার নামে পশ্চিমা শ্লোগান একটি প্রতারণা। নারীর দেহের সৌন্দর্যকে খুলে খুলে ব্যবসা করার একটি লোভনীয় ফাঁদ। এটা তার আত্মার অবমাননা এবং তার সম্মান ও মর্যাদাকে ধ্বংস করার শয়তানী ষড়যন্ত্র। পশ্চিমা সমাজ দাবি করে যে, নারীকে তারা সঠিক মর্যাদা দিয়েছে। আর কঠিন বাস্তবতা হলো তাদেরকে তাদের সম্মানজনক অবস্থান থেকে নামিয়ে উপপত্নী, রক্ষিতা এবং সুশীল সমাজের লালসা পূরণের জন্য উড়ন্ত প্রজাপতি বানিয়ে ছেড়েছে। ফলে তারা এখন ভোগ-বিলাসী পুরুষের নাগালের আওতায় থাকা ভোগের পুতুল আর যৌন কারবারীদের ব্যবসায়ের সস্তা পণ্য। যা আড়াল করা হয়েছে শিল্প ও সংস্কৃতির মনোলোভা রঙিন পর্দা দ্বারা।

ঋ. নারী ধর্ষণের সর্বোচ্চ হার আমেরিকায়

উন্নত বিশ্বের শীর্ষ অবস্থানে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নৈমিত্তিক সংঘটিত নারী ধর্ষণের হার সমগ্র বিশ্বে রেকর্ড যা কেউ স্পর্শও করতে পারবে না। ১৯৯০ সালের এফবিআই-এর দেয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রতিদিন গড়ে ১৭৫৬ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আরো একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিদিন সংঘটিত ধর্ষণ অপরাধের সংখ্যা ১৯০০ উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে সাল উল্লেখ করা হয়নি তবে অনুমান করা হয় তা ১৯৯২/১৯৯৩ সালের কথা। হয়তো আমেরিকানরা এ ব্যাপারে পরবর্তী দু'তিন বছরে আরো 'সাহসী' হয়ে উঠেছে।

এবার একটা কাল্পনীক দৃশ্যপট ধরা যাক– আমেরিকান নারী সমাজ ইসলামী হিজাব পালন করছে। যখনি কোনো পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকাচ্ছে, কোনো অশ্লীল চিন্তা মনে এসে যেতে পারে ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার দৃষ্টিকে নীচে নামিয়ে নিচ্ছে। রাস্তা ঘাটে যেখানেই কোনো নারী দৃশ্যমান হচ্ছে, কব্জী পর্যন্ত তার দুটি হাত আর সামান্য সাদামাটা সাজগোজহীন মুখমণ্ডলের কিয়দাংশ ব্যাস, বাকি অংশ সব ঢোলাঢালা হিজাবে ঢাকা। তদুপরি রাষ্ট্রীয় বিধান এমন যে, যদি কোনো পুরুষ ধর্ষণের অপরাধ করে তার শাস্তি–জনসমক্ষে প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড।

এখন আপনাকে প্রশ্ন করছি, গোটা পরিবেশটা যদি বাস্তবেই এমন হয় তাহলে আমেরিকার এই নারী ধর্ষণের ভয়ঙ্কর চিত্র আরো বৃদ্ধি পাবে ? না একই অবস্থানে থাকবে? নাকি কমে যাবে এবং কমতে কমতে একদিন এই জঘণ্য অপরাধ শূন্যের কোটায় নেমে আসবে।

এ.ইসলামী শরীয়তের পূর্ণ বিধান কার্যকর হলে ধর্ষণের হার নিঃশেষ হয়ে যাবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই। যেহেতু শরীয়তের বিধনাবলী, মানুষেরই জন্য তাদের সৃষ্টিকর্তা বিধাতার মনোনীত বিধিবিধান। তা যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে তার ফলাফল কল্যাণী অমিয় ধারা হয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করবে। ইসলামী শরীয়ত যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় পৃথিবীর যে কোনো ভূখণ্ডে– তা আমেরিকাই হোক অথবা ইউরোপ বা পৃথিবীর অন্য যে কোনো দেশে। তার প্রথম প্রতিক্রিয়া হবে এই যে, সে দেশের গোটা সমাজ একসাথে বুক ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেবে।

কাজেই 'হিজাব' নারীকে অসম্মানী করেনি বরং সম্মানের সর্বোচ্চ আসন দিয়েছে। আর সংরক্ষণ করেছে তার শালীনতা ও পবিত্রতা।

মুসলমানরা মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের অনেকেই মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অথবা ধর্ম সম্পর্কিত কোনো আলোচনা উঠলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত প্রশ্নটি মুসলমানদের দিকে ছুঁড়ে মারা হয়। সুপরিকল্পিতভাবে, বিরামহীনভাবে প্রচারের প্রতিটি মিডিয়া থেকে আরো অসংখ্য মিথ্যা ও ভুল তথ্যসহ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হচ্ছে। কার্যত এই ধরনের ভুল তথ্য পরিবেশন ও মিথ্যা রটনা মুসলমানদেরকে বর্বর জাতী হিসেবে চিহ্নিত করা এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যই করা হয়। ওকলাহোমায় বোমা বিস্ফোরণের পরে আমেরিকান প্রচার মাধ্যমের মুসলিম বিরোধী প্রচারণার একটি জ্বলন্ত নমুনা পাওয়া গেছে। যেখানে এই আক্রমণের নেপথ্যে 'মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র' কাজ করেছে বলে সংবাদ মাধ্যমগুলো ঘোষণা দেয়। অথচ মূল অপরাধী হিসেবে পরবর্তী সময়ে যাকে সনাক্ত করা হয়েছে সে ছিল 'আমেরিকান সেনা বাহিনীরই একজন সৈনিক'। আসুন এবার সন্ত্রাসবাদ ও মৌলবাদের অভিযোগ দুটি পর্যালোনা করে দেখি।

ক. মৌলবাদী শব্দের সংজ্ঞা

মৌলবাদী এমন এক ব্যক্তি যে অনুসরণ ও আনুগত্য করে তার চিন্তা গবেষণার বিশ্বাসের মৌলনীতি ও শিক্ষাসমূহকে। কেউ যদি ভালো ডাক্তার হতে চায় তাহলে তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং কঠোর অনুশীলন করতে হবে ঔষধের মূল কার্যকারীতার ওপর। অর্থাৎ তাকে হতে হবে ঔষধী জগতের একনিষ্ঠ মৌলবাদী। একইভাবে কেউ যদি গণিতবীদ হতে চায় তাহলে তাকে জানতে হবে, বুঝতে পারতে হবে এবং একাগ্র মনোযোগে অনুশীলন করতে হবে গণিতের মূল সূত্রের ওপরে। অর্থাৎ তাকে হতে হবে গণিত শাস্ত্রের মৌলবাদী। অনুরূপভাবে কেউ যদি বিজ্ঞানী হতে চায় তাহলে তাকে জেনে নিতে হবে, বুঝতে হবে এবং গভীর গবেষণায় মত্ত হয়ে অনুশীলন করতে হবে বিজ্ঞানের মৌলতত্ত্ব ও মূল সূত্রগুলোর ওপর। অর্থাৎ তাকে হতে হবে বিজ্ঞান জগতের মৌলবাদী।

খ. সমস্ত মৌলবাদী এক রকম নয়

সব মৌলবাদীর চিত্র যেমন একই তুলি দিয়ে আঁকা নয়। তেমনি ভালো কী মন্দ, হুট করে এরকম কোনো মন্তব্য করাও সম্ভব নয়। যে কোনো মৌলবাদীর শ্রেণীবিন্যাস নির্ভর করে তার কাজ ও কর্মের জগত নিয়ে। একজন মৌলবাদী ডাকাত বা চোর সমাজের জন্য ক্ষতিকর অর্থাৎ সে অনাকাঙ্ক্ষিত। একজন মৌলবাদী চিকিৎসক সমাজের জন্য কল্যাণকর এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।

গ. একজন মৌলবাদী মুসলমান হতে পেরে আমি গর্বিত

আমি একজন মৌলবাদী মুসলমান। আল্লাহ্‌র অসীম দয়ায়– জানি, বুঝি এবং চেষ্টা করি ইসলামের মৌলনীতিসমূহকে অনুশীলন করতে। আল্লাহর প্রতি সমর্পিত কোনো মুসলিম একজন মৌলবাদী মুসলিম আখ্যায়ীত হতে লজ্জিত হবে না। একজন মৌলবাদী মুসলিম হতে পেরে আমি গর্বিত এবং নিজেকে সার্থক মনে করি। কারণ আমি জানি ও বিশ্বাস করি ইসলামের মৌলনীতিসমূহ বিশ্বমানবতার জন্য শুধুই কল্যাণকর। পৃথিবীর জন্য তা আশির্বাদ স্বরূপ। ইসলামের এমন একটি মূলনীতি খুঁজে পাওয়া যাবে না যা বিশ্বমানবতার জন্য ক্ষতিকর কিংবা সামগ্রীকভাবে মানুষের স্বার্থের প্রতিকূলে।

অনেক মানুষ ইসলাম সম্পর্কে তাদের মনে বহু ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে এবং ইসলামের কিছু কিছু শিক্ষা বা বিধানকে অযৌক্তিক ও অবিচারমূলক বলে আখ্যায়ীত করে।এটা ইসলাম সম্পর্কে তাদের অশুদ্ধও অপ্রতুল জ্ঞানের কারণে।

কেউ যদি মুক্তবুদ্ধি মুক্তমন ও ইনসাফপূর্ণ মনোবৃত্তি নিয়ে ইসলামের শিক্ষাসমূহকে সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখেন, তাহলে তার কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, 'ইসলাম' ব্যক্তির স্বতন্ত্র পর্যায়ে অথবা সমাজের সামগ্রীক পর্যায়ে– মানবতার জন্য অফুরন্ত কল্যাণের এক অমিয় ঝর্ণাধারা।

ঘ. মৌলবাদ শব্দটির আভিধানিক অর্থ

ওয়েবস্টার ডিকশনারী মতে, "ফান্ডামেন্টালিজম' ছিল একটি আন্দোলনের নাম। যা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আমেরিকার প্রোটেস্ট্যান্টবাদীরা গড়ে তুলেছিল। তা ছিল আধুনিকতাবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং বাইবেলের নির্ভুল হওয়ার স্বপক্ষে কঠিন চাপ প্রয়োগ। এ নির্ভুলতার দাবী শুধু বিশ্বাস ও শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়–

সাহিত্য ও ঐতিহাসিক তথ্যাদির ক্ষেত্রেও। বাইবেলের ভাষা, আক্ষরীক অর্থে তাদের সরাসরি গড কর্তৃক নির্বাচিত এ প্রেক্ষাপটে মৌলবাদ শব্দের উৎপত্তি। সুতারাং 'মৌলবাদ' এমনই একটি শব্দ যা প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছিল খ্রীস্টানদের উক্ত দলের জন্য যারা বিশ্বাস করতো 'বাইবেল' কোনো ধরনের ভুল ভ্রান্তিহীন, আক্ষরিকভাবেই আল্লাহ্‌র কথা।

অক্সফোর্ড ডিকশনারী মতে 'ফাণ্ডামেন্টালিজম'– এর অর্থ– যে কোনো ধর্মের মৌলিক শিক্ষাসমূহকে কোনো প্রকার শৈথীল্য প্রদর্শন না করে কঠোর অনুশীলন, লালন ও পালন করা। বিশেষ করে ইসলামের।

আজ যখনই কেউ ' মৌলবাদ' শব্দটি ব্যবহার করে তার ভাবনায় চলে আসে এমন একজন মুসলমান যে সন্ত্রাসী।

ঙ. প্রত্যেক মুসলিমের সন্ত্রাসী হওয়াই উচিত

প্রত্যেক মুসলিমকেই একজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। সন্ত্রাসী তো তাকেই বলা হয় যে ত্রাস বা আতঙ্কের সৃষ্টি করে। যখনই কোনো ডাকাত একজন পুলিশকে দেখে– সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, একজন পুলিশ ডাকাতের জন্য 'সন্ত্রাসী'। এভাবেই চোর-ডাকাত, ধর্ষণকারী, বদমাশ ও সমাজবিরোধী সকল দুষ্কৃতিকারীর জন্য একজন মুসলমানকে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী হতে হবে। যখনই সমাজবিরোধী কোনো বদমাশ একজন মুসলমানকে দেখবে সে যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, 'সন্ত্রাসী' শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এমন এক লোকের জন্য যে সাধারণ লোকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। কাজেই একজন খাঁটি মুসলমান সন্ত্রাসী হবে অপরাধীদের জন্য–নিরীহ জন সাধারণের জন্য নয়। বস্তুত একজন মুসলিমকে হয়ে উঠতে হবে নিরীহ জনসাধারণের সামনে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতীক।

চ. একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য আলাদা আলাদা নাম দেয়া হয়েছে – সন্ত্রাসী এবং দেশ প্রেমিক

ইংরেজদের গোলামী থেকে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করল তখন ভারত স্বাধীনতার অনেক যোদ্ধা যারা গান্ধীবাদী অহিংসার পথকে সমর্থন করেনি। ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে 'সন্ত্রাসী' লেবেল লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই একই যোদ্ধাদের ভারতীয়রা সম্মানিত করেছে। আর সেই একই কর্মকাণ্ডের জন্য আখ্যা দিয়েছে 'দেশ প্রেমিক'।

এভাবেই দুটি ভিন্ন ভিন্ন নাম দেয়া হয়েছিল একই লোকদেরকে একই কর্মকাণ্ডের জন্য। এক শ্রেণী যেখানে তাদেরকে বলেছে একজন 'সন্ত্রাসী'। সেখানে অন্য শ্রেণী তাদেরকে বলেছে 'দেশ প্রেমিক'। যারা মনে করত ইংরেজদের অধিকার ছিল ভারত শাসন করার তারা তাদেরকে সন্ত্রাসী বলত। আর যারা মনে করত ইংরেজদের কোনো অধিকার নেই ভারত শাসন করার, তারা তারেদকে বলত 'দেশ প্রেমিক' এবং 'মুক্তিযোদ্ধা'। কাজেই এ বিষয়টা হালকা করে গুরুত্বহীনভাবে দেখার কোনো উপায় নেই। কারো ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করার পূর্বে ভালো করে শুনে নিতে হবে উভয় পক্ষের যাবতীয় বক্তব্য। অবস্থা ও প্রেক্ষিতের পর্যালোচনা করতে হবে। ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারপর বিচার করা যেতে পারে।

ছ. ইসলাম মানে শান্তি

ইসলাম শব্দের উৎপত্তি 'সালাম' থেকে। যার অর্থ– শান্তি। একটা জীবনব্যবস্থা। যার মৌলিক নীতিসমূহ তার অনুসারীদের শিক্ষা দেয় পৃথিবীতে শান্তির বার্তা পৌছে দিতে।

প্রতিটি মুসলিম মৌলবাদী হয়ে নিষ্ঠার সাথে শান্তির ধর্ম ইসলামের মৌলিক শিক্ষাসমূহের অনুসরণ করতে হবে তাকে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসী হয়ে উঠতে হবে সমাজবিরোধী বদমাশদের সামনে। যাতে সমাজে ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার ও শান্তি-শৃঙ্খলা দিন দিন বৃদ্ধি পায়– বজায় থাকে।

আমিষ খাদ্য গ্রহণ

প্রশ্ন ঃ পশুহত্যা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিষ্ঠুর কাজ। তাহলে মুসলমানরা কেন এতো পশু হত্যা করে, আমিষ খাদ্য গ্রহণ করে।

ডা. জাকির নায়েক ঃ 'নিরামিষবাদ' বিশ্বব্যাপী বর্তমানে একটা আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। অনেকেই এটাকে যুক্ত করেছে 'পশু অধিকারের' সাথে। সন্দেহ নেই অনেকেই মনে করেন মাংস ভক্ষণ এবং অন্যান্য উৎপাদিত আমিষ দ্রব্যসামগ্রী 'পশু অধিকার' কে হরণ করে।

ইসলাম নির্দেশ করে সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি অনুকম্পার নীতি গ্রহন করতে। একই সাথে ইসলাম এ বিশ্বাসও লালন করে যে, এ পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদ ও পশুপাখি এবং জলজপ্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণে। তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এসব সম্পদ ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে ব্যবহার করা এবং আল্লাহ্‌র এই নেয়ামত ও আমানতসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ করা।

এ বিতর্কের সম্ভাব্য আরো কিছু দিক পর্যালোচনা করে নেয়া যাক।

ক. একজন মুসলিম সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী হওয়াও সম্ভব

একজন মুসলিম সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী হয়েও খাঁটি মুসলিম থাকতে পারেন। এটা বাধ্যতামূলক কিছু নয় যে, একজন মুসলিমকে আমিষ খাদ্য খেতেই হবে।

খ. কুরআন মুসলমানদেরকে আমিষ খাবারের অনুমতি দিয়েছে ঃ মুসলমানদের পথ প্রদর্শক আল-কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ তার প্রমাণ। ইরশাদ হয়েছে –

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْئٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ـ

অর্থঃ আর গৃহপালিত পশু তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য এদের থেকে তোমরা উষ্ণতা পাও (গরমের পোশাক) এবং আরো অসংখ্য উপকারী জিনিস। আর এদের (গোস্ত) তোমরা খাও। (১৬ঃ৫)

অর্থঃ হে ঈমানদারগন! পূরণ করো তোমাদের প্রতি সকল অর্পিত দায়িত্ব। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সকল চতুষ্পদ জন্তু– অন্য কারো নামে তা জবাই করা না হয়ে থাকলে। (৫ঃ১)

অর্থঃ আর গৃহপালিত পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে শেখার মতো উদাহরণ। এদের পেট থেকে আমরা এমন কিছু উৎপাদন করি (দুধ) যা তোমরা পান করো। এগুলোর মধ্যে আরো অসংখ্য উপকার রয়েছে তোমাদের জন্য আর এদের (গোস্ত) তোমরা খাও। (২৩ ঃ ২১)

গ. গোস্ত পুষ্টিকর এবং আমিষপূর্ণ

আমিষ খাদ্য প্রোটিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস। জৈবিকভাবেই তা প্রোটিন সমৃদ্ধ। আটটি অতি প্রয়োজনীয় এ্যামাইনো এসিড যা দেহের মাধ্যমে সমন্বিত হয় না। তাই খাদ্যের দ্বারা তা সরবরাহ করতে হয়। মাংসের মধ্যে আরো রয়েছে লৌহ, ভিটামিন বি-১ এবং নিয়াসিন।

ঘ. মানুষের দাঁত সব ধরনের খাদ্য গ্রহণে সক্ষম করে বিন্যস্ত

আপনি যদি পর্যবেক্ষণ করেন তৃণভোজী প্রাণীর দাঁতের বিন্যাসের প্রতি– যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ ইত্যাদি। আপনি দেখে বিস্মিত হবেন যে, তা সব একই রকম। সকল পশুর দাঁত ভোঁতা তথা সমতল যা তৃণ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের জন্য উপযোগী। আর আপনি যদি লক্ষ্য করেন মাংসখেকো পশুদের দন্ত বিন্যাসের প্রতি অর্থাৎ বাঘ, সিংহ, শৃগাল, হায়েনা ইত্যাদি– এগুলোর দাঁত ধারালো যা মাংসের জন্য উপযোগী। পক্ষান্তরে মানুষের দাঁত লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে সমতলের ভোঁতা দাঁত যেমন আছে তেমনি ধারালো এবং চোখা দাঁতও রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের দাঁত মাংস ও তৃণ উভয় ধরনের খাদ্য গ্রহণের জন্য উপযোগী। এক কথায় 'সর্বভূক'।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি চাইতেন মানুষ শুধু তরিতরকারী খাবে তাহলে আমাদের মুখে ধারালো দাঁত ক'টি দিলেন কেন? এর দ্বারা এটাই কী প্রমাণিত হয় না যে, খোদ সৃষ্টিকর্তাই চান যে, মানুষ সব ধরনের খাবার গ্রহণ করুক।

ঙ. আমিষ ও নিরামিষ দুই রকমের খাদ্যই মানুষ হজম করতে পারে তৃণভোজী প্রাণির হজম প্রক্রিয়া শুধু তৃণ জাতীয় খাদ্যই হজম করতে পারে। মাংসখেকো প্রাণির হজম প্রক্রিয়া শুধু মাংস হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষের হজম প্রক্রিয়া তৃণ ও মাংস উভয় ধরণের খাদ্যই হজম করতে সক্ষম।

আল্লাহ যদি চাইতেন আমরা শুধু নিরামিষ খাদ্য ভক্ষণ করি তাহলে তিনি আমাদেরকে এমন হজমশক্তি দিলেন কেন যা দিয়ে তৃণ ও মাংস উভয় ধরনের খাদ্যই হজম করা যায়?

চ. হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থ আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে

১. অনেক হিন্দু রয়েছে যারা নিরামিষ ভোজী। তারা আমিষ খাদ্যকে তাদের ধর্ম বিরোধী মনে করে। অথচ প্রকৃত সত্য হলো, হিন্দুশাস্ত্রই মাংস খাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে– পরম বিজ্ঞ সাধু-সন্তরা আমিষ খাদ্য গ্রহণ করতেন।

২. হিন্দুদের আইনগ্রন্থ 'মনুস্রুতি' পঞ্চম অধ্যায় শ্লোক ৩০-এ রয়েছে খাদ্য ভক্ষণকারী যে খাবার খায়, সেই সব পশুর যা খাওয়া যায়, মন্দ কিছু করে না। এমনকি সে যদি তা করে দিনের পর দিন। ঈশ্বর নিজেই সৃষ্টি করেছেন কিছু ভক্ষিত হবে আর কিছু ভক্ষণ করবে।

৩. মনুস্রুতীর পঞ্চম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে আরো বলা হয়েছে– 'মাংস ভক্ষণ শুদ্ধ' উৎসর্গের জন্য। ঈশ্বরের বিধান হিসেবে বংশ পরম্পরায় তা জানা আছে।

৪. আর মনুস্রুতীর পঞ্চম অধ্যায় ৩৯–৪০ নং শ্লোকে বলা হয়েছেঃ "ঈশ্বর নিজেই সৃষ্টি করেছেন– উৎসর্গের পশু উৎসর্গের জন্যই। সুতরাং উৎসর্গের জন্য হত্যা–হত্যা নয়।

৫. মহাভারত অনুশাসন পর্ব ৮৮ অধ্যায়ে আছে– ধর্মরাজ যুধিষ্টির ও পিতামহ ভীষ্ম, এদের মধ্যে কথোপকথন– কেউ যদি শ্রাদ্ধ করতে চায় তাহলে সে অনুষ্ঠানে কী ধরনের খাবার খেতে দিলে স্বর্গীয় পিতৃ পুরুষ (এবং মাতাগন) সন্তুষ্ট হবেন। যুধিষ্টির বলল, হে মহাশক্তির মহাপ্রভু! কী সেই সকল বস্তু সামগ্রী যা– যদি উৎসর্গ করা হয় তাহলে তারা প্রশান্তি লাভ করবে? কী সেই বস্তু সামগ্রী যা (উৎসর্গ করলে) স্থায়ী হবে? কী সেই বস্তু যা (উৎসর্গ করলে) চিরস্থায়ী হবে?

ভীষ্ম বলেন, তাহলে শোন হে যুধিষ্টির! কী সেই সব সামগ্রী। যারা গভীর জ্ঞান রাখে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পর্কে– যা উপযোগী শ্রাদ্ধের জন্য। আর কী সেই ফল-ফলাদি যা তার সঙ্গে যাবে। সিমের বিচীর সাথে চাল, বার্লী, মাশা এবং পানি আর বৃক্ষমূল (আদা, আলু বা মূলা প্রভৃতি) তার সাথে ফলাহার। যদি স্বর্গীয় পিতৃদেবদের শ্রাদ্ধে দেয়া হয় হে রাজা! তা হলে তারা ১ মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মৎস দিয়ে আপ্যায়ন করলে স্বর্গীয় পিতৃকুল ২ মাস পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকবে। ভেড়ার মাংস দিয়ে– ৩মাস। খরগোশ দিয়ে ৪ মাস। ছাগ-মাংস দিয়ে ৫ মাস। শুকর-মাংস দিয়ে ৬ মাস। পাখীর মাংস দিয়ে আপ্যায়ীত করলে ৭ মাস। হরিণের মধ্যে 'প্রিসাতা' হরিণ শিকার করে খাওয়ালে ৮ মাস এবং 'রুরু' হরিণ দিলে ৯ মাস। আর গাভীর মাংস দিলে ১০ মাস। মহিষের মাংস দিলে তাদের সন্তুষ্টি ১১ মাস বজায় থাকে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গরুর মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করলে, বিশেষ করে বলা হয়েছে তাদের সন্তুষ্টি থাকে পুরো এক বছর। ঘি মিশ্রিত পায়েশ, স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের কাছে গরুর মাংসের মতোই প্রিয়। ভদ্রিনাসার (বড় ষাঁড়) মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করলে পিতৃপুরুষ ১২ বছর সন্তুষ্ট থাকেন। পিতৃপুরুষের মৃত্যু বার্ষিকীর দিনটি যদি শুক্ল পক্ষের হয় আর তখন যদি গণ্ডারের মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে খাওয়ানো যায়– স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে যায়। 'কালাসকা' কাঞ্চন ফুলের পাপড়ি আর লাল ছাগলের মাংস যদি দিতে পারো তা হলেও তাদের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে যাবে।

অতএব আপনি যদি চান আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে থাকুক তাহলে লাল ছাগলের মাংস দিয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আপ্যায়ন করতে হবে।

ছ. হিন্দু ধর্ম অন্য সকল ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত

হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থ তার অনুসারীদের আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। তথাপি বহু হিন্দু নিরামিষ ভোজনকে সংযোজন করে নিয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এটা এসেছে 'জৈন' ধর্ম থেকে।

জ. উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে

বিশেস কিছু ধর্ম খাদ্য হিসেবে শুধুমাত্র নিরামিষ খাদ্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে। কারণ তারা জীব হত্যার বিরোধী। যদি কেউ কোনো সৃষ্ট জীবকে হত্যা না করে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আমি হবো প্রথম ব্যক্তি যে এধরনের জীবন যাপন পদ্ধতিকে বেছে নেব।

অতীত যুগের মানুষ মনে করত উদ্ভিদের প্রাণ নেই। অথচ বর্তমানে তা বিশ্ববাসীর কাছে সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট যে, উদ্ভীদেরও প্রাণ আছে। ফলে সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজী হয়েও জীব হত্যা না করার শর্ত পূরণ হচ্ছে না।

ঝ. উদ্ভিদরা ব্যাথাও অনুভব করতে পারে

এর পরেও হয়তো নিরামিষ ভোজীরা বলবেন, প্রাণ থাকলে কী হবে উদ্ভিদ তা ব্যাথা অনুভব করতে পারে না। তাই পশু হত্যার চেয়ে এটা তাদের কম অপরাধ। আজকের বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে উদ্ভিদও ব্যাথ্যা অনুভব করে কিন্তু তাদের সে আর্ত চিৎকার মানুষই শোনার ক্ষমতা রাখে না কারণ 20 Herts. থেকে 2000 Herts এর ওপরে বা নীচের কোনো শব্দ মানুষের শ্রুতি ধারণ করতে সক্ষম নয়। অথচ একটি কুকুর 40,000 Herts পর্যন্ত শুনতে পারে। এজন্য কুকুরের জন্য নিরব 'হুইসেল' বানানো হয়েছে যার ফ্রীকোয়েন্সী 20,000 Herts এর বেশি এবং 40,000 Herts এর মধ্যে। এসমস্ত হুইসল শুধু কুকুর শুনতে পারে, মানুষ পারে না। কুকুর এ হুইসেল শুনে তার মালিককে চিনে নিতে পারে এবং সে চলে আসে তার মনিবের কাছে।

আমেরিকার এক খামারের মালিক বহু গবেষণার পর একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যার মাধ্যমে উদ্ভিদের কান্না মানুষের শ্রুতিযোগ্য করে তোলা যায়। সেই বিজ্ঞানী বোঝে নিতে পারত, উদ্ভিদ কখন পানির জন্য চিৎকার করত। এমনকী এখনকার গবেষণা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, উদ্ভিদ সুখ ও দুঃখ অনুভব করতে পারে এবং চিৎকার করে কাঁদতেও পারে।

দু'টি ইন্দ্রীয়ানুভূতি কম সম্পন্ন প্রাণীকে হত্যা করার অপরাধ কম নয়

এবার নিরামিষ ভোজীরা তর্কে অবতীর্ণ হয়ে বলবেন যে, উদ্ভিদের মাত্র দু'টি অথবা তিনটি অনুভূতির ইন্দ্রীয় আছে আর পশুর রয়েছে পাঁচটি। কাজেই পশু হত্যার চেয়ে উদ্ভিদ হত্যার অপরাধের পরিমাণ কম।

ধরুন আপনার এক সহজাত ভাই জন্মগত ভাবেই অন্ধ ও বধির। সে চোখে দেখে না কানেও শোনে না। অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে দুটি ইন্দ্রীয় তার কম। সে যখন পূর্ণ বয়স্ক হলো তখন এক লোক নির্দয়ভাবে তাকে খুন করল। খুনী গ্রেপ্তারের পর– বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে আপনি কী বিচারপতিকে বলবেন, মহামান্য আদালত খুনীকে আপনি পাঁচ ভাগের তিন ভাগ শাস্তি দিন?

কুরআন বলেছে يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا .

অর্থঃ হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে পবিত্র উত্তম (জিনিসগুলো) খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করো। (২ঃ১৬৮)

ট. গৃহপালিত পশুর সংখ্যাধিক্য

পৃথিবীর প্রতিটি লোক যদি ফল-মূল তরিতরকারী ও শাক স্বজিকে খাদ্য হিসাবে বেছে নেয় তা হলে গবাদী পশুর জন্য ভূ-পৃষ্ঠ ছেড়ে দিয়ে মানুষকে অন্য কোনো গ্রহে গিয়ে বাস করতে হবে। আর খাল বিল নদী নালা ও সাগর মহাসাগর পানি শূন্য হয়ে পড়বে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর আধিক্যে। কেননা উভয় শ্রেণীর জন্ম হার ও প্রবৃদ্ধি এত বেশি যে, এক শতাব্দির বেশি সময় লাগবে না পৃথিবী তাদের দখলে চলে যেতে।

সুতরাং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা খুব ভালো করেই জানেন এবং বোঝেন তাঁর সৃষ্টিকূলের ভারসাম্য তিনি কিভাবে রক্ষা করবেন। কাজেই এটা অতি সহজেই অনুমেয় যে, তিনি কী কারণে আমাদেরকে মাছ মাংস খাবার অনুমতি দিয়েছেন।

পশু জবাই করার ইসলামী পদ্ধতি– নির্দয়

প্রশ্নঃ মুসলমানরা কেন এত ধীরে ধীরে কষ্ট দিয়ে নির্দয়ভাবে পশু জবাই করে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ একটি বিরাট অংশ মানুষের সমালোচনার বিষয় বস্তু হলো পশু জবাইয়ের ইসলামী পদ্ধতি। নিচের বিষয়গুলো পর্যালোচনায় প্রমাণ হয়ে যাবে জবাই পদ্ধতিটি শুধু মানবিকই নয় বৈজ্ঞানিকও বটে।

ক. পশু জবাই করার ইসলামী পদ্ধতি

ইসলামী পদ্ধতিতে একটি পশু জবাই করতে হলে নিম্নবর্ণিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে।

১. সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করতে হবে

খুব ধারালো অস্ত্র দিয়ে দ্রুততার সঙ্গে পশুটি জবাই করতে হবে যেন ওটা ব্যাথা কম পায়।

২.গলনালী, শ্বাশ নালী ও রক্তবাহী ঘাড়ের রগ কাটতে হবে

'যাবীহাহ্' আরবী শব্দ যার অর্থ 'জবাই করা হয়েছে'। জবাই করা হয় গলা, শ্বসনালী ও ঘাড়ের রক্তবাহী রগগুলো কেটে। মেরুদণ্ডের তন্ত্রদণ্ডের তন্ত্রী কাটা যাবে না।

৩. শরীরের রক্ত প্রবাহিত হতে হবে

জবায়ের পর দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করার পূর্বে দেহের সমস্ত রক্ত বের করে দিতে হবে। অধিকাংশ রক্ত বের করে দিতে হবে এই জন্য যে, তা ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু ইত্যাদির নিরাপদ নিবাস ও বংশ বিস্তারের জায়গা কাজেই মেরুদণ্ডের তন্ত্রী কোন মতেই কাটা যাবে না। কারণ হৃদযন্ত্রের দিকে যেসব স্নায়ু তন্তু রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে এসময়। যা হৃদপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়ে দেবার ফলে রক্ত নালীসমূহে রক্ত আটকা পড়ে যাবে।

খ. রক্ত, রোগ-জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার বাহন

জৈব-বিষ ব্যাকটেরিয়া ও রোগ-জীবাণু ইত্যাদির সহজ বাহক রক্ত। সুতরাং ইসলামী জবাই পদ্ধতি স্বাস্থ্যবিধি সম্মত। কেননা রক্ত এমন, যার মধ্যে জৈব-বিষ, রোগ-জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়া বাসা বেধে থাকে। যা অসংখ্য রোগ ব্যাধির কারণ হয়।

ঘ. গোস্ত অনেক দিন ভালো থাকে

পৃথিবীতে পশু হত্যার মধ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে জবাই করা পশুর মাংস বেশি দিন ভালো থাকে। কারণ তাতে রক্তের পরিমাণ থাকে নাম মাত্র।

ঙ. পশু ব্যাথা অনুভব করে না ঃ ক্ষীপ্রতার সঙ্গে গলনালীগুলো কাটার ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুতে রক্ত প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যে রক্ত প্রবাহ ব্যাথ্যা বোধের কারণ। একারণে পশু ব্যাথ্যা বোধ করে উঠতে পারে না। মরার সময় ওটা যে ছট্ ফট্ করে তা ব্যাথ্যার জন্য নয় বরং রক্তের ঘাটতি পড়ে যাওয়ায় মাংসপেশির শৈথিল্য ও সংকোচনের জন্য এবং দ্রুত গতিতে রক্ত বেরিয়ে যাবার কারণে।

আমিষ খাদ্য মুসলমানদেরকে প্রচণ্ড উগ্র বানিয়ে দেয়

প্রশ্ন ঃ বিজ্ঞান বলে, যে যা খায় তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। তাহলে ইসলাম কেন মুসলিমদেরকে আমিষ খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দিল। যেখানে পশুর মাংস ব্যক্তিকে হিংস্র ও দুঃসাহসী করে তুলতে পারে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ক. ইসলামে পশুর মধ্যে শুধু তৃণভোজী পশু খাওয়া অনুমোদিত। এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, ব্যক্তি যা খায় তার প্রতিক্রিয়া তার আচরণে প্রকাশ পায়। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ইত্যাদি হিংস্র মাংসখেকো প্রাণী খাওয়া ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে– কারণ এ ধরনের হিংস্র প্রাণীর মাংস খেয়ে মানুষ হয়তো সত্যি সত্যিই হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ, এদের মধ্যে হিংস্রতা রয়েছে, তাই ইসলামে এগুলোর নিষিদ্ধ করেছে। সে কারণে ইসলাম শুধু মাত্র গরু, মহিশ, ছাগল, ভেড়ার, মতো শান্ত স্বভাব ও খুব সহজে পোষমানা প্রাণীর মাংস খেতে অনুমতি দেয়। এ কারণে মুসলমানরা শান্তিকামী -শান্তিপ্রিয়।

খ. কুরআন বলছে– যা কিছু মন্দ রাসূল তা নিষিদ্ধ করেছেন

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰئِثَ ـ

অর্থ, রাসূল তাদেরকে ভালো কাজ করতে আদেশ করেন। আর নিষেধ করেন সমস্ত মন্দ থেকে এবং তিনি তাদের জন্য হালাল করেছেন যা কিছু ভাল, পবিত্র। আর হারাম করেছেন যা কিছু মন্দ অপবিত্র। (৭ঃ ১৫৭) এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন– وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ج وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

অর্থ, রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ করো। আর যে সব থেকে তিনি নিষেধ করেন সে সব থেকে বিরত থাকে। (৫৯-৭)

একজন মুসলমানের জন্য তাদের রাসূলের এই কথা যথেষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা চান না মানুষ এমন কোনো ধরনের গোস্ত খায়– যেখানে অন্য কিছু ধরনকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

গ. মাংসখেকো প্রাণী খাবার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর বাণী

সহীহ বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত বেশ কিছু হাদীসের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত মুসলিম শরীফের 'শিকার ও জবাই' অধ্যায়ের ৪৭৫ নং হাদীস, সুনানে ইবনে মাজাহর ১৩ অধ্যায়ের ৩২৩২ থেকে ৩২৩৪ হাদীসসমুহ উল্লেখযোগ্য। রাসূল (স) যাহা খেতে নিষেধ করেছেন ঃ

১. তীক্ষ্ম ধারালো দাঁতওয়ালা হিংস্র জন্তু। অর্থাৎ মাংসখেকো বন্য পশু বিশেষভাবে বেড়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ, শেয়াল, নেকড়ে এবং হায়না ইত্যাদি।

২. তীক্ষ্ম দাঁতের অন্যান্য প্রাণী যেমন ইঁদুর, ন্যাংটি ইদুর, ছুঁচো ও ধারালো নখওয়ালা খরগোশ ইত্যাদি।

৩. সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী যেমন– সাপ, কুমীর ইত্যাদি।

৪. ধারালো ঠোঁট ও নখরওয়ালা শিকারী পাখি যেমন চিল, শুকুন, কাক, পেঁচা ইত্যাদি।

পৃথিবীতে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক দলিল নেই যে, আমিষ খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষ উগ্র ও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে।

মুসলমানরা কাবাগৃহের পূজা করে

প্রশ্নঃ ইসলাম যেখানে আকার বা মূর্তি পূজাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেখানে তারা নিজেরাই কেন তাদের প্রার্থনায় কাবার প্রতি নত হয়ে তার উপাসনা করে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ কা'বা মুসলমানদের 'কেবলা'। যা তারা প্রার্থনার দিক নির্দেশক হিসেবে গণ্য করে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, মুসলমানরা তাদের প্রার্থনায় কা'বার দিকে মুখ ফিরায় বটে তবে তারা কাবা ঘরের উপাসনা করে না। বরং উপাসনা করে সেই ঘরের মালিক অদৃশ্য আল্লাহ তা'আলার।

আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রিয় হাবীবকে লক্ষ্য করে বলেন–

অর্থঃ তোমার বার বার আকাশের পানে মুখ করে তাকানো আমরা দেখেছি। এখন আমি কী তোমাকে ঘুরিয়ে দেব সেই কেবলার দিকে যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে? তাহলে ঘুরিয়ে নাও তোমার মুখ সেই মাসজিদুল হারামের দিকে। (এখন থেকে) যেখানেই তোমরা থাক না কেন (নামাযে) তার দিকেই মুখ ফিরিয়ে নেবে।

ক. ইসলাম দৃঢ় ঐক্যকে উৎসাহিত করে

যেমন, মুসলিমরা যদি সালাত আদায় করতে চায় তাহলে এমনটা হতে পারে যে, কারো ইচ্ছা হবে উত্তর দিকে ফিরে নামায পড়তে, কারো ইচ্ছা হবে দক্ষিণ দিকে ফিরতে। তাই ইবাদতের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে যেখানেই তারা থাকুক না কেন এক আল্লাহ্‌র প্রতি একমুখী হয়ে তাদের সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। তাই 'কাবা' সে একটি দিকের দিক-নির্দেশক, অন্য কিছুই নয়। কাবার পশ্চিমাঞ্চলে যে মুসলমানরা বাস করে তারা মুখ করবে পূর্ব দিকে আর পূর্বাঞ্চলে যারা বাস করে তারা মুখ করবে পশ্চিম দিকে। একইভাবে উত্তরাঞ্চলের লোকেরা দক্ষিণ দিকে আর দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা উত্তর দিকে।

খ. পৃথিবী গোলকের কেন্দ্রবিন্দু কা'বা

মুসলমানরাই সর্ব প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র এঁকেছিল। তাদের মানচিত্রে দক্ষিণ ছিল ওপর দিকে আর উত্তর ছিল নিচের দিকে। তখন কা'বা ছিল কেন্দ্রবিন্দুতে। পরবর্তিযুগে পশ্চিমা মানচিত্রকররা পৃথিবীর যে মানচিত্র আঁকলো তাতে ওপর দিকটা নিচে আর নিচের দিকটা ওপরে করা হলো অর্থাৎ উত্তর হলো ওপরের দিকে আর দক্ষিণ হলো নিচের দিকে। আলহামদুলিল্লাহ এ ক্ষেত্রেও "কাবাই মানচিত্রের কেন্দ্রবিন্দু থেকে গেল"।

গ. কা'বাকে তাওয়াফ করা আল্লাহ্‌র একত্বের নির্দেশক

মুসলিম কা'বা যেয়ারতে মক্কায় গেলে কাবাঘর 'তাওয়াফ' করে। অর্থাৎ কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করে চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে। কাজটি এক আল্লাহকে বিশ্বাস ও ইবাদতের নিদর্শন। প্রতিটি বৃত্ত গোলাকার, এর একটিই কেন্দ্র বিন্দু থাকে। কাজেই উপাসনার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্– এটা তারই অন্যতম নিদর্শন।

ঘ. হযরত ওমর (রা) এর হাদীস ঃ

হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা) এর একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে। হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী যাকে 'আছার' বলা যায়। বুখারী শরীফের হজ্জ সম্পর্কিত ৩৫৬ অধ্যায়ে ৬৭৫ নং হাদীস, ওমর (রা) বলছেন, "আমি জানি তুমি একটি পাথরখণ্ড মাত্র এবং না কোনো উপকার করতে সক্ষম না কোনো ক্ষতি। আমি যদি না দেখতাম স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূল (স) তোমাকে স্পর্শ করেছেন তা হলে কশ্মিনকালেও আমি তোমাকে স্পর্শ করতাম না।"

৬. লোকেরা কা'বা ঘরের ওপরে উঠে আযান দিয়েছিল

রাসূলুল্লাহ (স) এর সময়ে লোকেরা কা'বা ঘরের ছাদে উঠে আযান দিত। মুসলিম কা'বা ঘরের উপাসনা করে বলে যারা মনে করেন তাদেরকে যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কোন মূর্তি-পূজারী কী যে মূর্তির সে পূজা করে, তার মাথার ওপরে উঠে দাঁড়ায়?

অমুসলিমদের পবিত্র মক্কায় প্রবেশাধিকার নেই

প্রশ্নঃ পবিত্র মক্কা ও মদীনায় অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ একথা সত্য যে, আইনত মক্কা ও মদীনায় অমুসলিমদের প্রবেশানুমতি নেই। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো এই নিষিদ্ধতার নেপথ্য কারণ।

ক. সেনানিবাস এলাকায় সাধারণ নাগরিক প্রবেশানুমতি পায় না

আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। তা সত্ত্বেও এদেশের এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে আমার অবাধে প্রবেশানুমতি নেই। যেমন সেনানিবাস। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই সাধারণ নাগরিক প্রবেশের অনুমতি নেই এমন সব এলাকা রয়েছে। কেবল মাত্র সেনাবাহিনীর সদস্য এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সে সব এলাকায় প্রবেশানুমতি পায়।

একইভাবে ইসলাম গোটা বিশ্ববাসীর জন্য একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। মক্কা ও মদীনা এ দু'টি পবিত্র নগরিকে ইসলামের সেনানিবাস ধরা যেতে পারে। এখানে শুধু যারা তার অনুসারী এবং এর প্রতিরক্ষার সাথে জড়িত তারাই প্রবেশানুমতি পায় অর্থাৎ মুসলমানরা। সেনানিবাস সংরক্ষিত এলাকায় সাধারণ নাগরিকের প্রবেশ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যে কোনো বিবেকবান মানুষের নিকট অযৌক্তিক বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কোনো অমুসলিমের মক্কা-মদীনায় প্রবেশাধিকার নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন সঙ্গত বলে বিবেচিত নয়।

খ.মক্কা ও মদীনায় প্রবেশের 'ভিসা' ঃ

১. যখনি কোন লোক অন্য কোনো দেশে ভ্রমণ করতে চায়। প্রথমে তাকে সেদেশের 'ভিসা' পাবার জন্য আবেদন করতে হয়। অর্থাৎ সে দেশে প্রবেশের অনুমতি। প্রতিটি দেশে এ ক্ষেত্রে নিজস্ব আইন, 'নীতিমালা এবং কিছু শর্ত রয়েছে এসব কিছু পূরণ না হলে তারা 'ভিসা' দেবে না।

২. ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিনভাবে রক্ষণশীল দেশগুলোর মধ্যে সবার ওপরে আমেরিকা। বিশেষভাবে তৃতীয় বিশ্বের কোনো নাগরিককে ভিসা প্রদানের ব্যাপারে তাদের আছে অসংখ্য নিয়ম কানুন। আরো রয়েছে দুর্লভ ও দুরূহ শর্তসমূহ যা সাধারণ লোকদের আয়ত্বাধীন নয় কোনো ভাবেই।

৩. আমি সিঙ্গাপুর ভ্রমনে গিয়েছিলাম। তাদের ইমিগ্রেশন ফর্মে উল্লেখ ছিল– মাদকদ্রব্য বহনকারীর জন্য "মৃত্যুদণ্ড"। এখন সিঙ্গাপুরে প্রবেশানুমতি চাইলে আমাকে তাদের যে আইন তা মেনেই নিতে হবে। আমি তো আর বলতে পারি না 'মৃত্যুদণ্ড' মধ্যযুগীয় নৃশংস বর্বরদের শাস্তি। তাদের যাবতীয় নিয়ম-কানুন এবং শর্তগুলোকে যদি আমি মেনে নেই কেবলমাত্র তখনই আমাকে সে দেশে প্রবেশানুমতি দেবে।

৪. 'ভিসা'–পৃথিবীর যে কোনো লোকের জন্য মক্কা ও মদীনায় প্রবেশের অনুমতি পেতে হলে সর্বপ্রথম যে শর্তটি পূরণ করতে হবে তা হলো তার মুখে বলতে হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ "মানা যায় এমন কেউ নেই কিছু নেই আল্লাহ ছাড়া এবং মুহাম্মাদ (স) তাঁর প্রেরিত রাসূল"।

শুকরের মাংস নিষিদ্ধ

প্রশ্ন ঃ ইসলামে শুকরের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শুকরের মাংস ভক্ষণ ইসলামে নিষিদ্ধ। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো এই নিষিদ্ধতার কারণ।

ক. আল কুরআনে শুকরের মাংসের নিষিদ্ধতা

শুকরের মাংস খাওয়া নিষেধ সম্পর্কে অন্তত চারটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ ২ঃ১৭৩, ৫ঃ৩, ৬ঃ১৪৫, এবং ১৬ঃ১১৫।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ـ

অর্থ, "নিষিদ্ধ করা হলো তোমাদের জন্য (খাদ্য হিসেবে) মৃত পশুর মাংস, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং এমন পশুর মাংস) যা (জবাইয়ের সময়) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম স্মরণ করা হয়েছে। (৫ঃ ৩)

খ. বাইবেলে শুকর মাংস খাওয়ায় নিষিদ্ধতা

হয়তো একজন খ্রীষ্টান তার ধর্মগ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি দেখে সন্তুষ্ট হলে দেখতে পাবে যে, বাইবেলের 'লেভীটিকাস' গ্রন্থে শুকরের মাংস ভক্ষণ নিষেধ করেছে। বলা হয়েছেঃ

"এবং শুকর, যদিও তার খুর দ্বিখন্ডিত এবং খুরযুক্ত পদ বিশিষ্ট। এমন কী সে চিবিয়ে খায়, যাবর কাটে না। (তবু) ওটা অপরিচ্ছন্ন (অপবিত্র) তোমার জন্য"।

একই গন্থের ১১ অধ্যায় ৭ ও ৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ

ওগুলোর মাংস তুমি খাবে না এবং ওগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শও করবে না, ওগুলো 'অপবিত্র' তোমার জন্য।

বাইবেলের 'আইযায়াহ, গ্রন্থের ৬৫ অধ্যায় ২ থেকে ৫ পৃষ্ঠায়ও একই নিষিদ্ধতা রয়েছে।

গ. শুকরের মাংস ভক্ষণে বেশ কিছু মারাত্মক রোগের কারণ

অমুসলিম ও নাস্তিকরা হয়তো সঠিক কারণ ও বিজ্ঞানের যুক্তি প্রমাণের সাথে মেনে নিতে পারে– শুকর মাংস খাওয়া কমপক্ষে সত্তুরটি রোগের উদ্ভব ঘটাতে পারে। শুরুতে আক্রান্ত হতে পারে বিভিন্ন প্রকার কৃমির দ্বারা। যেমন বৃত্তাকার কৃমি, ক্ষুদ্র কাঁটাযুক্ত কৃমি ও বক্র ক্রিমি। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক হলো 'টাইনিয়া সোলিয়াম'। যেটাকে 'ফিতা কিমি' বলা হয়। এটা পেটের মধ্যে পালিত এবং অনেক লম্বা হয়। এর ডিম রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করে এবং শরীরের প্রায় সকল অঙ্গ অত্যঙ্গে ঢুকে পড়তে পারে, যদি এটা মস্তিস্কে, ঢুকে যায়, তাহলে স্মৃতি ভ্রষ্ট হয়ে যাবার কারণ হতে পারে। হৃদ-যন্ত্রের ভেতর ঢুকলে বন্ধ করে দিতে পারে হৃদযন্ত্রক্রিয়া। চোখে ঢুকতে পারলে অন্ধত্বের কারন, কলিজীতে ঢুকে পড়লে সেখানে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে অর্থাৎ এটা দেহের যে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

এরপরও রয়েছে আরো ভয়ঙ্কর 'ত্রীচুরা টিচুরাসীস'। এ সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা হলো ভালো করে রান্না করলে এর ডিম মারা যায়। এর ওপরে আমেরিকায় গবেষণা চালানো হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে রান্না করার পরও প্রতি ২৪ জনের ২২ জন এই 'ত্রীচুরা টিচুরাসীস' দ্বারা আক্রান্ত। প্রমাণিত হলো সাধারণ রান্নায় এ ডিম ধ্বংস হয় না।

ঘ. শুকর মাংসে চর্বি উৎপাদনের উপাদান প্রচুর

শুকর মাংসে পেশী তৈরীর উপাদানের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। পক্ষান্তরে চর্বি উৎপাদনের উপাদান অনেক। এ ধরণের চর্বি অধিকাংশ রক্ত নালীতে জমা হয়– যা কারণ হয় হাইপার টেনশান এবং হার্ট এ্যাটাকের। অবাক হবার কিছু নেই যে ৫০% ভাগ আমেরিকান হাইপার টেনশানের রুগী।

ঙ. পৃথিবীতে শুকর নোংরা ও পঙ্কিলতম জন্তু

এ জন্তুটি নিজেদের বিষ্ঠা, মানুষের মল ও ময়লাপূর্ণ জায়গায় বসবাস করতে চায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সমাজবদ্ধ সৃষ্টি কূলের মল, মেথর বা ময়লা পরিষ্কারক হিসাবেই সম্ভবত এটি সৃষ্টি করেছেন। আজ থেকে ৫০ কিংবা ৬০ বছর আগেও যখন সেনিটারী পায়খানা সিস্টেম আবিষ্কৃত হয়নি তখন যে কোনো শহরের পায়খানার ধরন ছিল, পশ্চাৎ থেকে মেতর এসে তা ট্যাঙ্কি ভরে নিয়ে যেত এবং শহরের উপকণ্ঠে ফেলতো। যা ছিল শুকরদের পরম আনন্দ নিবাস।

অনেকেই হয়তো এখন বিতর্কে অবতীর্ণ হবেন উন্নত বিশ্বে এখন শুকরের পরিচ্ছন্ন খামার করা হয়েছে। যেখানে এদের লালিত পালিত হয়। তথাপিও তাদের এই উন্নত, স্বাস্থ্যকর খামারেও ওগুলো গাদাগাদি করেই রাখা হয়। ওদেরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার যত ধরনের চেষ্টাই করা হোক না কেন প্রকৃতিগতভাবেই ওগুলো নোংরা। অতি আনন্দের সাথেই ওরা ওদের নিজেদের ও সঙ্গীদের বিষ্ঠা নিয়ে ওদের চোখ নাক দিয়ে নাড়া চাড়া করে অতঃপর উৎসবের খাদ্য হিসেবেই খায়।

চ. শুকর নির্লজ্জতায় জঘন্যতর পশু

ভূ-পৃষ্ঠের ওপরে শুকর অশ্লীলতায় নির্লজ্জতর জন্তু। শুকর একমাত্র পশু যেটা তার স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গে সংগম করার সময় অন্যান্য পুরুষ-সঙ্গীদের ডেকে নেয়। আমেরিকার ও ইউরোপের বেশিরভাগ লোকের প্রিয় খাদ্য শুকর মাংস। খাদ্যভ্যাস আচরণে প্রকাশ পায়, বিজ্ঞানের এ সূত্রের জীবন্ত নমুনা ওরাই। তাদের প্রিয় সংস্কৃতি ড্যান্স পার্টি গুলোতে নাচতে নাচতে উত্তেজনার উত্তুঙ্গে উঠে একে অপরের সাথে ' সেয়া'র জন্য বউ বদল করে নেয়। অনেকেই আবার জীবন্ত নীল ছবি স্বচোখে দেখার জন্য স্ত্রীর সঙ্গে সংগম করতে বন্ধু-বান্ধব ডেকে নেয়। তারপর একজন নারী নিয়ে চলে অনেক পুরুষের সম্মিলিত লীলাখেলা। ধন্য উন্নত বিশ্ব, ধন্য তাদের সর্বোন্নত সংস্কৃতি।

মদ্য পানের নিষিদ্ধতা

প্রশ্ন ঃ মদ্যপান ইসলামে নিষিদ্ধ কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বহু যুগ ধরে বিশ্বমানবতার জন্য 'এ্যালকোহল' তীব্র যন্ত্রণার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। মদ অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ এবং বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের ভয়ঙ্কর দুর্দশার কারণ। মানুষের সমাজে অসংখ্য সমস্যার নেপথ্যে আসল কারণ এই 'এ্যালকোহল' বা মদ। অপরাধ প্রবণতার

উর্ধগতি, ক্রমবর্ধমান মানসিক বিপর্যয় এবং কোটি কোটি ভাঙা ঘর-সংসার জীবন্ত প্রমাণ বহন করছে। সারা বিশ্বে এ্যালকোহলের নিরব তাণ্ডবলীলা চলছে।

ক. আল কুরআনে মদ্য পানের নিষিদ্ধতা

يَاۤيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَالۡمَيۡسِرُ وَالۡاَنۡصَابُ وَالۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ عَمَلِ الشَّيۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوۡهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ ـ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! মদ ও জুয়া, পাশা খেলা, তীর ছুঁড়ে ভাগ্য নিরূপণ করা এগুলো শয়তানের নিকৃষ্ট ধরনের জঘন্য কারসাজি। এসব পরিহার করো যেন তোমরা উন্নত (মানবতার) পথে অগ্রসর হতে পারো। সূরা মায়েদা -৯০

খ. বাইবেলে মদের নিষিদ্ধতা

১. আর মদ্য পানে মাতাল হয়ো না। (এফিসিয়ানেসঃ ৫ঃ১৪)

২. মদ্য একটি প্রতারক, কঠিন পানীয়, কুৎসীত কাজের উৎসাহক এবং যে এতে অভ্যস্ত হলো সে মুর্খতায় নিমজ্জিত হলো। (বাইবেলের নীতিবাক্য, মূল গ্রন্থ ঃ ২০-১)

গ. এ্যালকোহল বিবেককে বাধাগ্রস্ত করে

মানুষের মগজে একটি বিবেচনা কেন্দ্র বা পরিমাপক আছে। এ বিবেচনা কেন্দ্র মানুষকে সেই সকল কাজ করতে নিষেধ করে, যেসব কাজ সে মন্দ জানে। যেমন কোনো লোক সাধারণত তার পিতা-মাতা এবং গুরুজনের সঙ্গে কথা বলার সময় অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করে না। তাকে যদি কখনো প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে হয়, তাহলে তার বিবেচনা কেন্দ্র তথা বিবেক তাকে বাধা দেবে জনসমক্ষে এ কাজ করতে। এ জন্য সে গোপন জায়গা ব্যবহার করে।

মানুষ যখন মদ পান করে, তখন তার মাথার এই বিবেচনা কেন্দ্রটি স্থবির হয়ে পড়ে। মদ্য পানে মাতাল লোককে যে অস্বাভাবিক আচার আচরণ করতে দেখা যায় তার সুনির্দিষ্ট কারণ এটাই। যেমন মাতাল লোককে খারাপ কথা বলতে দেখা যায়, এমনকি সে যদি তার পিতা-মাতার সাথেও কথা বলতে থাকে। কেননা সে তখন তার এই ভুলকে উপলব্ধি করতেই অক্ষম হয়ে পড়ে। মাতাল হয়ে অনেকেই পেশাব করে দেয় নিজেদের কাপড়ে। তখন না পারে সে ঠিক মতো কথা বলতে, না পারে সোজা পায়ে হাঁটতে।

ঘ. ব্যভিচার, ধর্ষণ, এই সবকিছু মদ্যপায়ীদের মধ্যে বেশি সংঘটিত হয়

আমেরিকার ন্যাশনাল ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এর ন্যাশনাল ভিকটিমাইযেশান সারভে ব্যুরো অব জাস্টিস-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধু মাত্র ১৯৯৬ সালে প্রতিদিন গড়ে ২৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল, রিপোর্টের মন্তব্যে বলা হয়েছে ধর্ষকদের অধিকাংশই ঘটনার সময় মাতাল ছিল, নারী উৎপীড়নের বেলায়ও এদেরকেই বেশি পাওয়া যায়।

একই পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায় ৮% আমেরিকান মা-বোন, অথবা মেয়ের সঙ্গে যৌন কর্মে লিপ্ত। অর্থাৎ আমেরিকার প্রতি বারো বা তেরো জনের একজন এই কুকর্মে অভ্যস্ত এবং দু'জনের একজন অথবা উভয়ে এসময়

মাতাল থাকে। এইডস্ বিস্তারের ক্ষেত্রে মাদকের ভূমিকা কান ও মাথার মতো (অর্থাৎ কান টানলে মাথা আসে)। কাজেই মাদকাসক্তিই মারাত্মক ও প্রাণঘাতি ব্যাধি।

ঙ. প্রতিটি মাদকাসক্ত লোকই শুরুতে সৌখিন পানকারী থাকে

অনেকেই মদের পক্ষ নিয়ে বলবেন, ভাই পার্টি-পরিবেশে একটু আধটু হলে ভালোই লাগে। আমাদের দৌড় ঐ পর্যন্তই। এক কী দু'চুমুক। আমরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখি, আমরা মাতাল হই না ইত্যাদি।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের রেজাল্ট এই যে, প্রত্যেকটি মদ্যপ মাতালই শুরুতে সৌখিন পানকারী ছিল। এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি যে মাতাল হওয়ার জন্য মদ পান শুরু করেছিল। অপরদিকে কোনো সৌখিন মদখোর একথা বলতে পারবে না যে, বহু দিন যাবত এভাবেই দু'এক পেগ করেই খেয়ে এসেছি। কোনো দিন মাত্রা অতিক্রম হয়নি। আর মাতাল হলে কেমন লাগে সে স্বাধ ও পাইনি।

চ. জীবনে একবারও যদি কেউ মাতাল হয়ে লজ্জাকর কিছু কাজ করে বসে সে স্মৃতি তাকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত ভোগাবে।

ধরুন, কোনো সৌখিন সামাজিক মদ-খোর, জীবনে শুধু একবার নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাতাল হয়েছিল। আর সেই দিনই সে ধর্ষণ বা আপনজন কারো ওপরে যৌন অত্যাচার মূলক কোনো অঘটন করেছিল। পরবর্তী কোন সময় যদি সে, সেই কর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ক্ষমা পেয়েও গিয়ে থাকে তবুও তাকে সারাজীবন সেই স্মৃতির কুতসীৎ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে– যা করেছে সে এবং যার ওপর তা সংঘটিত হয়েছে সে– উভয়কেই এই অপূরণীয় ক্ষতির ভোগান্তি পোহাতে হবে।

ছ. হাদীসে মদের নিষিদ্ধতা রাসূল (স) বলেছেন

১. মদ যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীলতার মা (উৎস) এবং সকল মন্দের মধ্যে এটা সবচেয়ে লজ্জাকর। (সুনানে ইবনে মাজাহ্ অধ্যায় ৩০। হাদীস নং ৩৩৭১।)

২. এমন বস্তু, যা নেশাগ্রস্ত করে বেশি পরিমাণে তা নিষিদ্ধ (হারাম)। এমনকি তা স্বল্প পরিমাণ গ্রহণ করা হলেও। তাই এক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই। তা এক ঢোক অথবা এক ড্রাম।

৩. হযরত আয়শা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, মদের সঙ্গে জড়িত এমন দশ শ্রেণীর লোদের ওপরে আল্লাহ্র লানত। (১) যারা তা তৈরী করে (২) যাদের জন্য তা তৈরি হয় (৩) যারা তা পান করে। (৪) যারা তা বহন করে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যায় (৫) যাদের জন্য তা নিয়ে আসা হয় (৬) যারা তা পরিবেশন করে। (৭) যারা তা বিক্রি করে। (৮) যারা তা বিক্রি লব্ধ টাকা খায়। (৯) যারা তা ক্রয় এবং (১০) যারা তা ক্রয় করে অন্য আর একজনের জন্য।

জ. মদ-খোর যে সব রোগে আক্রান্ত হয়

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সামনে এমন বেশ কিছু রোগের উৎপত্তি পরিষ্কার হয়ে গেছে যেসব রোগে সাধারণত মদ-খোররাই আক্রান্ত হয়। মদ এমন একটি ব্যাধি, যার কারণে সারা বিশ্বে মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। লক্ষ লক্ষ আদম সন্তান শুধু মদ পানের কারণে পৃথিবী থেকে অকালে ঝরে গেছে। সাধারণত মদ্যপায়ীরাই আক্রান্ত হয় এমন অতি পরিচিত কিছু রোগের একটি ছোট্ট তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

১. কলিজা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাওয়া। যা লিভার সিরোসিস নামে খ্যাত।

২. অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের প্রদাহ।

৩. অন্ননালীর ক্যান্সার এবং মাথা, গলা, কলিজা ও মল নালীর ক্যান্সার।

৪. স্নায়ু ও মস্তিষ্কের সমস্ত রোগ।

৫. হৃৎপিন্ডে রক্ত সঞ্চালনের নালীসমূহের সমুদয় রোগ, গলনালী প্রদাহ এবং হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া।

৬. পক্ষাঘাত, সন্যাস রোগ এরকম আরো অন্যান্য প্যারালাইসিস।

৭. হৃদযন্ত্র ক্রিয়া সংক্রান্ত সকল রোগ, হাইপার টেনশান।

এরকম আরো অসংখ্য রোগ রয়েছে।

ঋ. মাদকাসক্তিই একটি ব্যাধি

চিকিৎসা বিজ্ঞানিরা মদখোরদের ব্যাপারে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। তারা এটাকে এখন আর নেশা বলছেন না, বলেন এটা নিজেই একটা রোগ। 'ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন' একটা পোষ্টার বের করেছে, তাতে বলা হয়েছে যদি 'মদই' রোগ হয়ে থাকে তাহলে পৃথিবীতে এটাই একমাত্র ব্যতিক্রম রোগ যা সুন্দর সুন্দর বোতলে ভরে বিক্রি হয়।

ঃ পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও টেলিভিশনের ন্যায় প্রচার মাধ্যমে এর বিজ্ঞাপন করা হয়।

ঃ দেশের জন্য রাজস্ব আমদানী করে।

ঃ মৃত্যুকে যে প্রকাশ্য রাজপথে নিয়ে আসে।

ঃ পারিবারিক জীবন ধ্বংস ও অপরাধ প্রবণতার মূল হোতা।

মদ শুধু একটি ব্যাধি নয়– বরং তা শয়তানের কারসাজি

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা মানুষের জন্য তাঁর সর্বোত্তম নেয়ামত আল-কুরআনে শয়তানের পাতানো এই লোভনীয় ফাঁদ সম্পর্কে আমদেরকে সাবধান করে দিয়েছেন। তাই কুরআনে বর্ণিত জীবন যাপন পদ্ধতিতে 'দ্বীনুল ফিৎরাহ' তথা মানুষের প্রকৃতিসম্মত জীবনব্যবস্থা 'ইসলাম' বলা হয়। এর সকল বিধি-নিষেধের মূল উদ্দেশ্য মানব প্রকৃতিকে সমস্ত অনিষ্ট থেকে হেফাযত করা। মদ মানুষকে তার প্রকৃতগত স্বভাবের ওপর থাকতে দেয় না। একথা কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তির বেলায় যেমন সত্য তেমনি বৃহত্তর কোনো সমাজের ক্ষেত্রেও। এটা মানুষকে নিচে নামিয়ে পশুর স্তরে নিয়ে আসে অথচ মানুষ দাবি করে যে, সে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠতম। সর্বোপরি ইসলামে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সাক্ষীদ্বয়ের মাঝে সমতা

প্রশ্নঃ কেন দুজন নারী সাক্ষী একজন পুরুষের সমতুল্য?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ক. একজন পুরুষ সাক্ষীর বিকল্প হিসেবে দুজন নারী সাক্ষী সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সাক্ষী প্রদান প্রসঙ্গে কুরআনের কমপক্ষে তিনটি আয়াত রয়েছে যেখানে পুরুষ ও নারীর পার্থক্য করা হয়নি।

১. উত্তরাধিকারের ওসীয়ত করার সময় সাক্ষী হিসেবে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে।

অর্থঃ বিশ্বাসীগন! তোমাদের মধ্যে কেউ যখন মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে তখন অসীয়ত করতে হলে তোমাদের মধ্য থেকে সাক্ষী রেখো। তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। অথবা বাইরের, যখন তোমরা এ পৃথিবীর বক্ষে (কোথাও) সফরে রয়েছো, আর এমন সময় মৃত্যু এসে হাজির হয়েছে। -সূরা মায়েদাঃ ১০৬

২. তালাকের ক্ষেত্রে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর কথা বলা হয়েছে। যেমন-

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ـ

অর্থঃ এবং সাক্ষীর জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে বেছে নাও। আর প্রতিষ্ঠিত করো এ সাক্ষী শুধু আল্লাহ্‌র জন্য। -সূরা তালাকঃ ২

৩. নারীর প্রতি ব্যভিচারের অভিযোগে- চারজন সাক্ষী দাঁড় করাতে হবে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ج وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ

অর্থঃ আর যারা সত্বী নারীদের সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ আনবে। তারপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না। তাহলে তাদেরকে আশিবার বেত্রাঘাত করো। আর কোনো দিন তাদের কোনো সাক্ষ্য গ্রহন করবে না। আর এ সমস্ত লোক তারাই যারা ফাসেক। -সূরা নূরঃ ৪

খ. টাকা পয়সা লেন-দেনের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের স্থলে দু'জন নারীর সাক্ষীর প্রয়োজন

একজন পুরুষের স্থলে দু'জন নারীর সাক্ষী সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য একথা সত্য নয়। এর সত্যতা শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। সাক্ষী সম্বন্ধে কুরআনে পাঁচটি আয়াত আছে যেখানে নারী কিংবা পুরুষ পৃথক একটি করে উল্লেখ করা হয়নি। আর একজন পুরুষের স্থলে দু'জন নারীর সাক্ষীর কথা মাত্র একটি আয়াতে বলা হয়েছে। সূরা বাকারা ২৮২ আয়াত। এ আয়াতটির বিশেষ বৈশিষ্ট হলো কুরআনের দীর্ঘতম আয়াত এবং তা ব্যবসা ও টাকা-পয়সা লেন-দেন সংক্রান্ত।

কুরআনে বলা হয়েছে

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! যদি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমরা একে অপরের সঙ্গে লেন-দেন করো। তাহলে তা লিখে নিও... অতঃপর তোমাদের নিজেদের মধ্যের দু'জন পুরুষকে সাক্ষী বানাও। তখন যদি দু'জন পুরুষের ব্যবস্থা না করা যায়, তবে একজন পুরুষ ও যাদের সাক্ষীর সম্বন্ধে তোমরা আস্থাশীল এমন দু'জন নারী বেছে নাও যেন একজন ভুল করলে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। -সূরা বাকারাঃ ২৮২

সকল ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তির নির্দেশ করা হয়েছে এবং সেখানে দু'জন সাক্ষী রাখার কথা বলা হয়েছে। আর সে দু'জনই পুরুষ হতে হবে। কিন্তু যদি সে ধরণের আস্থাভাজন দু'জন পুরুষ লোকের ব্যবস্থা না করা যায় কেবল তখন, অন্ততঃ একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা থাকতেই হবে।

এখানে একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ধরা যাক কেউ একজন তার একটি রোগের জন্য অপারেশন করতে মনস্থ করেছে। নিশ্চিত হবার জন্য সে সমমানের যদি দু'জন সার্জনের পরামর্শ নেবে। কারণঃবশত দু'জন

সার্জনের ব্যবস্থা করতে সে ব্যর্থ হয় তখন বিকল্প হিসেবে একজন সার্জন এবং দু'জন সাধারণ এম বি বি এস-এর পরামর্শ গ্রহণ করল।

অনুরূপভাবে ব্যবসা ও ঋণ লেন-দেনের ক্ষেত্রে দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখতে বলা হয়েছে। ইসলাম চায় পরিবারের খোর-পোষের জন্য উপার্জনের দায়ভার পুরুষ বহন করুক। তাই অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব যেখানে পুরুষের কাঁধে ন্যাস্ত। পৃথিবীতে প্রচলিত সাধারণ বাস্তবতাও তাই। কাজেই অর্থনৈতিক লেন-দেনে নারীর তুলনায় পুরুষই সুদক্ষ।

বিকল্প হিসেবে যে, একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর কথা বলা হয়েছে। তার সুস্পষ্ট কারণও বলে দেয়া হয়েছে যে, একজন যদি কোনো ভুল করে বসে তাহলে অন্যজন যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। কুরআন এক্ষেত্রে 'তা'দিল' শব্দ ব্যবহার করেছে যার অর্থ তালগোল পাকিয়ে ফেলা। অথবা ভুল করা। অনেকেই শব্দটির অর্থ করেছেন 'ভুলে যাওয়া' এটা শুদ্ধ নয়। যা হোক আর্থিক লেনদেনই একমাত্র বিষয় যে ক্ষেত্রে সাক্ষী হিসেবে একজন পুরুষের বিকল্প দু'জন নারী।

গ. হত্যা মামলার ক্ষেত্রেও সাক্ষী হিসেবে দু'জন নারী একজন পুরুষের বিকল্প

কিছু ইসলামী আইন বেত্তাগণের মতে, হত্যা মামলার সাক্ষী প্রদানের ক্ষেত্রে নারীসুলভ আচরণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এ রকম পরিস্থিতিতে একজন পুরুষের তুলনায় একজন নারী অতি মাত্রায় ঘাবড়ে যায়। তার নারী সুলভ ভাবাবেগ তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিতে পারে। এ কারণেই কিছু বিশেষজ্ঞ আলেম খুনের কেসে 'একজন পুরুষের বিকল্প হিসিবে দু'জন নারীর সাক্ষী' এই রায় দিয়েছেন। বাদবাকি ব্যাপারে একজন নারীর সাক্ষী এক জন পুরুষের সাক্ষীর সমান মূল্যমানের।

ঘ. কুরআন সুস্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছে– একজন নারীর সাক্ষী একজন পুরুষের সমান

কিছু বিশেষজ্ঞ আলেম যদিও এ সম্পর্কে জোরালো মতামত দিয়েছেন যে, একজন পুরুষের সাক্ষীর বিকল্প দু'জন নারীর সাক্ষী, বিষয়টা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু নির্দ্বিদায় একথা মেনে নেয়া যায় না। কেননা কুরআন নিজে তা সমান করে দিয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍ بِاللّٰهِ لا اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ـ

অর্থঃ আর যারা তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে অভিযোগ করবে অথচ তাদের কাছে তাদের নিজেদের বাদে অন্য কোনো সাক্ষদাতা নেই। তাহলে তাদের একজনের সাক্ষ্যই চার বার গ্রহণ যোগ্য হবে। -সূরা নূরঃ ৬

ঙ. হযরত আয়েশা (রা)-এর একক সাক্ষী হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য

মুসলমানদের নিকট নির্দেশনার জন্য কুরআনের পরেই মূল্যবান উৎস হলো হাদীস, সেই হাদীসসমূহের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত ২২২০ খানা হাদীস কেবল মাত্র তাঁর একক সাক্ষীর ওপরে ভিত্তি করেই বিশুদ্ধতার সকল বিবেচনায় উত্তীর্ণ। কাজেই ক্ষেত্র অনুযায়ী একজন নারীর সাক্ষীই যে গ্রহণযোগ্য, এরপর তার জন্য আর কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়ে না।

ইসলামী আইন-শাস্ত্রবীদগণের অনেকেই এ ব্যাপারে একমত যে, চাঁদ দেখার সম্বন্ধে একজন 'মো'মেনা' নারীর স্বাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য। বিষয়টা নিশ্চয় ভেবে দেখার মতো। অনুরূপভাবে ইসলামের 'রোযা'র কার্যকরিতার ব্যাপারে সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠি একজন মাত্র নারীর সাক্ষী দানের ওপরেই নির্ভর করতে পারে।

আবার কোনো কোনো ইসলামী পণ্ডিত বলেছেন, রমযানের চাঁদ দেখার জন্য একজন সাক্ষী এবং ঈদের চাঁদ দেখার জন্য দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন। সাক্ষীগণের পুরুষ বা নারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই।

চ. বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষী অগ্রগণ্য

কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নারীর সাক্ষীই গ্রহণযোগ্য, যেক্ষেত্রে পুরুষের কোনো ভূমিকাই নেই। যেমন কোনো মহিলা মাইয়্যেতের গোসল করানোর সাক্ষী একজন নারীর পক্ষেই হওয়া সম্ভব।

দৃশ্যত সাক্ষীদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় তা আদৌ লিঙ্গ বৈষম্যের জন্য নয়। বরং তা ইসলামের বিবেচনায় সমাজে নারী ও পুরুষের প্রকৃতি ও ভূমিকার পার্থক্যের দরুন।

উত্তরাধিকার

প্রশ্নঃ ইসলামী আইনে উত্তরাধিকারী সম্পদের ক্ষেত্রে একজন নারীর অংশ একজন পুরুষের অর্ধেক কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ক. কুরআনে উত্তরাধিকার ঃ যথাযোগ্য হকদারের মধ্যে উত্তরাধিকারী সম্পদ বন্টনের সুনির্দিষ্ট বিস্তারিত নির্দেশনা কুরআনে উল্লেখ আছে।

উত্তরাধিকার বিধান সংক্রান্ত কুরআনী আয়াতসমূহঃ

সূরা বাকারা ঃ ১৮০, সূরা বাকারা ঃ ২৪০, সূরা নিসাঃ ৭-৯, সূরা নিসাঃ ৩৩, সূরা মায়েদাহ ঃ ১০৬-১০৮

খ. আত্মীয়স্বজনের জন্য উত্তরাধিকারে সুনির্দিষ্ট অংশ ঃ

কুরআন মাজিদে তিনটি আয়াতে বিস্তারিতভাবে নিকটাত্মীয়দের অংশ বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থঃ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেনঃ পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান হবে। (উত্তরাধিকারী) যদি দুইজনের বেশি নারী হয় তবে তাদেরকে সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দেয়া হবে। আর একজন নারী হলে মোট সম্পদের অর্ধেক পাবে। মৃতব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকে ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। আর সে যদি নিঃসন্তান হয়, এবং পিতা-মাতা একমাত্র উত্তরাধিকারী হয় তাহলে মাকে দেয়া হবে তিন ভাগের এক ভাগ। মৃতের ভাই বোন থাকলে মা সেই ছয় ভাগের এক ভাগই পাবে। এসব বন্টন হবে মৃতের কোনো অসীয়ত থাকলে তা এবং ঋণ থাকলে তা আদায় করার পরে।

তোমাদের পিতা-মাতা এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততী, তোমাদের জানা নেই এদের মধ্যে তোমাদের কল্যাণের দিক দিয়ে কারা ঘনিষ্টতর। এই বন্টন ব্যবস্থা ফরয করে দেয়া হয়েছে (তোমাদের জন্য) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। আল্লাহ তো সব কিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং মহামহীম জ্ঞানের আধার।

আর তোমাদের স্ত্রীরা যা কিছু সম্পদ রেখে গেছে, তার অর্ধেক তোমরা পাবে যদি তারা নিঃসন্তান হয়। সন্তান থাকলে তোমরা পাবে রেখে যাওয়া সম্পত্তির চারভাগের এক ভাগ– তাদের করে যাওয়া অসীয়ত এবং ঋণ থাকলে তা সব আদায়ের পরে। আর (তোমরা মারা গেলে) তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পদের মধ্যে তারা পাবে চার

ভাগের একভাগ যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। সন্তান থাকলে তারা পাবে আট ভাগের একভাগ। তা-ও কার্যকর হবে তোমাদের কোনো অসীয়ত এবং ঋণ থাকলে তা পরিশোধের পর।

আর যদি এমন কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যার না আছে কোনো সন্তান আর না আছে পিতা-মাতা। আছে এক ভাই অথবা এক বোন তাহলে তাদের প্রত্যেকে (কোনো পার্থক্য ব্যতীত পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। আর ভাই বোন যদি দুই এর বেশি হয় তাহলে তারা সবাই মিলে মোট সম্পদের তিন ভাগের একভাগ পাবে। তা-ও কোনো অসীয়ত এবং ঋণ থাকলে তা পরিশোধের পরে। কোনো ক্রমেই কারো কোনো ক্ষতি করা বা হতে দেয়া যাবে না। (এসব কিছু) আল্লাহ্‌র দেয়া উপদেশমালা। আল্লাহ সব কিছুর ব্যাপারেই পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং পরম ধৈর্য্যশীল। -সূরা নিসাঃ ১১-১২

কুরআনে বলা হয়েছে

অর্থঃ তারা আপনার নিকট ফতোয়া (ফয়সালা) জানতে চায়। বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন– নিঃসন্তান ও পিতৃ-মাতৃহীন মৃত-ব্যক্তির সম্পদ বণ্টন সম্বন্ধে। যদি এমন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, যার কোনো সন্তান নেই, আছে এক বোন। তাহলে সে (বোন) পাবে সম্পদের অর্ধেক আর যদি (এরকম কোনো) বোন মারা যায় তাহলে ভাই সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। মৃতের উত্তরাধিকারী যদি সকল বোন হয় তাহলে রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ তারা পাবে। আর যদি কয়েকজন ভাই বোন হয় তাহলে পুরুষের অংশ নারীর অংশের দু'জনার সমান।

আল্লাহ (এই সকল জটিল বিষয়গুলো খুলে খুলে) স্পষ্ট করে দিচ্ছেন তোমাদের জন্য যেন তোমরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে না যাও। প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কেই আল্লাহ পূর্ণ অবহিত। -সূরা নিসাঃ ১৭৬

গ. প্রতিপক্ষ পুরুষের তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষ নারী সমান অথবা বেশির অধিকারী হয়

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নারী অধিকারী হয় প্রতিপক্ষ পুরুষের অর্ধেক। যাই হোক এটা কিন্তু সর্বক্ষেত্রে নয়। যেমন– মৃত ব্যক্তি যার পিতা-মাতাও নেই, পুত্র কন্যাও নেই। আছে বৈপিত্রীয় ভাই ও বোন। এদের প্রত্যেকে এক ষষ্টমাংশ করে পাবে।

মৃতের পুত্র কন্যা থাকলে মাতা-পিতা দুজনেই এক ষষ্টমাংশ করে পাবে। ক্ষেত্র বিশেষে নারী উত্তরাধিকার হয় পুরুষের দ্বিগুন। মৃত যদি এমন একজন নারী হয় যার না কোনো সন্তান আছে না আছে ভাই বোন, তবে আছে স্বামী এবং মা ও বাবা। এখানে মৃতের স্বামী পাবে অর্ধেক সম্পদ এবং মা পাবে এক তৃতীয়াংশ আর বাবা পাবে এক ষষ্টমাংশ। বিশেষ এই ক্ষেত্রটিতে বাবার তুলনায় মা পাচ্ছে দ্বিগুন।

ঘ. সাধারণত পুরুষের অর্ধেক অংশের উত্তরাধিকারী হয় নারী

১. পুত্র যে পরিমানের উত্তরাধিকারী হয় কন্যা তার অর্ধেক।

২. মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে স্বামী চারের এক অংশ স্ত্রী আটের এক অংশ।

৩. মৃতের সন্তান থাকলে স্বামী পাবে দুইয়ের এক অংশ স্ত্রী পাবে চারের এক অংশ।

৪. যদি মৃতের পিতা-মাতা অথবা সন্তান না থাকে তাহলে ভাই যা পাবে বোন পাবে তার অর্ধেক।

ঙ.পুরুষ নারীর চেয়ে দ্বিগুন সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়, কারণ সে পরিবারের আর্থিক প্রয়োজনের যোগানদাতা

ইসলামে নারীর ওপরে পরিবারের কোনো আর্থিক বাধ্যবাধকতা এবং অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব নেই যা পুরুষের ওপর ন্যাস্ত আছে। কোনো মেয়ের বিয়ের পূর্বপর্যন্ত থাকা, খাওয়া, কাপড়-চোপড় এবং বাদবাকী আর্থিক প্রয়োজনের যোগানদাতা তার বাবা অথবা ভাই। বিবাহের পরে এসব দায়িত্ব স্বামীর অথবা পুত্রের। ইসলাম পুরুষের ওপরই তার পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মিটানোর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। এসব দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার জন্যই তাকে উত্তরাধিকারে দ্বিগুণ অংশ দেয়া হয়েছে।

যেমন, এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং নগদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে এক লোক মারা গেল। এখন উত্তরাধিকার বন্টনে ছেলে মালিক হলো পূর্ণ এক লক্ষ টাকার আর মেয়ে পেলো মাত্র পঞ্চাম হাজার টাকা। কিন্তু পরিবারের যাবতীয় আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব এখন ছেলের ঘাড়ে। সে সব প্রয়োজন পূরণে ছেলেকে প্রায় সব টাকাই ব্যয় করে ফেলতে হচ্ছে। অথবা ধরা যাক প্রায় আশি হাজার টাকা ব্যয় করে এখন তার কাছে রয়েছে মাত্র বিশ হাজার টাকা। অপরদিকে মেয়ের প্রাপ্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা তা থেকে কারো জন্য একটি পয়সা খরচ করার কোনো দায়-দায়িত্ব তার ওপরে নেই এবং সে বাধ্যও নয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ টাকাটাই তার কাছে গচ্ছিত আছে।

এখন লক্ষ করুন আশি-নব্বই এমন কী পুরোটাই প্রয়োজনে ব্যয় হতে পারে এমন ঝুঁকির মুখে, একদিকে ঝুঁকিপূর্ণ একলক্ষ টাকা অপরদিকে সংরক্ষিত পঞ্চাশ হাজার টাকা– কে কোনটা নিতে চাইবেন?

পরকাল বা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন

প্রশ্ন ঃ কীভাবে প্রমাণ করবেন, পরকালের অস্তিত্ব অর্থাৎ 'মরণের পরে আবার একটি চির স্থায়ী জীবন আছে'?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ক. 'পরকালে আস্থা' অন্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়–

বহুলোক আশ্চর্য হয়ে যান এ কথা ভেবে যে, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসম্মত প্রকৃতির কোনো মানুষ কিভাবে পরকাল বা মৃত্যুর পরে পূর্ণজীবনের ওপরে আস্থা রাখতে পারে? তারা মনে করে যে, যারা পরকালে আস্থাশীল তাদের সেই আস্থা একটি অন্ধ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

নিঃসন্দেহে পরকালে আমার আস্থা সঙ্গত যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

খ.'পরকাল' একটি যৌক্তিক বিশ্বাস

বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি নিয়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অন্তত হাজারের ওপরে আয়াত ধারণ করে আছে (এ প্রসঙ্গে আমার বই কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সুসঙ্গত অথবা অসঙ্গত) অতীত কয়েক শতাব্দীতে কুরআন বর্ণিত বিজ্ঞানের অসংখ্য বিষয় সত্যায়িত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখনও সে পর্যায়ে গিয়ে পৌছতে সক্ষম হয়নি যাতে কুরআন বর্ণিত প্রতিটি বিষয়কে সত্যায়ীত করতে পারে।

যদি ও কুরআন বর্ণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের ৮০% ভাগ সত্যতা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়ে থাকে। বাকি থাকলো মাত্র ২০% ভাগ, যে সব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কাছে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই। যেখানে বিজ্ঞানই এখন পর্যন্ত সে পর্যায়ে পৌছায়নি বা সক্ষম হয়নি যাতে কুরআনের সকল বর্ণনাকে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে

পারে। কাজেই আমাদের সীমাবদ্ধ বা সীমিত জ্ঞান নিয়ে আমরা নিশ্চিত করে ঐ ২০% ভাগ অনুদ্‌ঘাটিত সত্যাসত্যের এমন কী একটি আয়াতও ভুল– একথা বলতে পারি না।

তাই কুরআনের ৮০% ভাগ যেখানে চূড়ান্তভাবে সত্য হিসেবে প্রমাণিত এবং বাকি ২০% ভাগ শুধু প্রমাণের অপেক্ষায়। সেখানে যৌক্তিকতা এটাই বলবে যে, ঐ ২০% ভাগও সত্য বলেই প্রমাণিত হবে। কুরআনে বর্ণিত পরকালীন চির স্থায়ী জীবনের বিষয়টি ঐ ২০% ভাগের অন্তর্ভূক্ত, যা অনুদ্‌ঘাটিত একটি সত্য। যৌক্তিকতা এখানে তার সত্যতার প্রতি মত দেবে।

গ. 'পরকাল দর্শন' ব্যতীত শান্তিও মানবীক মূল্যবোধসমূহ সম্পূর্ণ অর্থহীন

ডাকাতি করা ভালো না মন্দ কাজ? ভারসাম্যপূর্ণ সাধারণ একজন লোকও বলবেন, এটা জঘন্য কাজ। পরকালের ভালো-মন্দ যে বিশ্বাস করে না সে কেমন করে একজন শক্তিশালী ও প্রভাবশালী কিলার বোঝাবে যে, ডাকাতি একটি জঘন্যতর অপরাধ?

ধরা যাক, পৃথিবীতে আমি একজন শক্তিশালী অপরাধী, একই সঙ্গে আমি একজন বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী মানুষ। আমি বলব ডাকাতি একটি ভালো কর্ম কেননা এটা আমাকে বিলাসী জীবন যাপন করার সহায়তা করছে– তাই ডাকাতি আমার জন্য ভালো।

যদি কোন ব্যক্তি আমার সম্মুখে উপযুক্ত একটি যুক্তিও দাঁড় করিয়ে দেখাতে পারে যে, ডাকাতি আমার জন্য মন্দ কেন? তাহলে সঙ্গে সঙ্গে একাজ আমি ত্যাগ করব।

১. কেউ হয়তো একথা বলবে যার সর্বস্ব ডাকাতি হয়ে গেছে সে সমস্যায় পড়বে

আমি নিশ্চয় তার সঙ্গে একমত যে, যার ওপর ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে তার জন্য এটা মন্দ। কিন্তু এটা আমার জন্য তো বেশ ভালো। আমি যদি হাজার ডলার ডাকাতি করে থাকি তবে মহানন্দে কোনো পাঁচতারা হোটেলে দু'চার বেলা খাবার খেতে পারব।

২. তোমার ওপরেও কেউ ডাকাতি করতে পারে

কেউ হয়তো বলবে একদিন আমার সর্বস্বও ডাকাতি হতে পারে। আমার কাছে থেকে কেউ কোন কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। কারণ আমি নিজেই অনেক শক্তিশালী। অন্তত শ'খানেক বডিগার্ড রয়েছে আমার। ডাকাতি আমি করি, আমার ঘরে কে ডাকাতি করবে? একজন সাধারণ লোকের জন্য ডাকাতি একটা ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হতে পারে কিন্তু আমার মতো প্রভাবশালী লোকের জন্য নয়।

৩. পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে

কেউ হয়তো বলবে পুলিশ তোমাকে একদিন গ্রেপ্তার করবে। পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করবে না। কারণ পুলিশকে আমি রীতিমতো মাসোহারা দেই। এমনকি শক্তিশালী এক মন্ত্রীকেও আমি মোটা অংকের চাঁদা দেই। হ্যাঁ এ ব্যাপারে আমি একমত যে, একজন সাধারণ লোক ডাকাতি করলে সে ধরা পড়তে পারে। কিন্তু আমার তো এধরনের কোনো ভয়ই নেই। ধরা পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে আমি মুক্ত হয়ে যাবো এ ধরনের গ্যারান্টি আমার আছে। যুক্তিপূর্ণ অন্তত একটা কারণ কেউ আমাকে দেখাক– কেন এটা আমার জন্য মন্দ এবং কেন বা এ পেশা আমি ছেড়ে দেব।

৪. কেউ হয়তো বলবে এটা উপরি পয়সা, কষ্টার্জিত নয়

আমি তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত– এটা খুব সহজে উপার্জিত টাকা। মূলত এটাই তো আসল কারণ, যে জন্য আমি ডাকাতি করি। যদি কোনো লোকের সামনে উপার্জনের দু'টো পথ খোলা থাকে– একটা সহজ আর একটা কঠিন, বুদ্ধিমান যে কোনো মানুষ সহজ পথটাকেই তো বেছে নেবে!

৫. এটা মানবতা বিরোধী

কেউ হয়তো বলবে এটা মানবতা বিরোধী। মানুষের জন্য মানুষের ভাবা উচিত। আমি তাদের নিকট পাল্টা প্রশ্ন করব। মানবতার এ বিধান কে লিখেছে? কেন আমি তা মানতে যাব? এ আইন হতে পারে আবেগ প্রবণ ও অনুভূতিশীল লোকদের জন্য ভালো। কিন্তু আমি উপযুক্ত যুক্তি ছাড়া কিছুই মানতে রাজি না-মানুষের ভাবনা আমি ভাবতে যাবো কোন দুঃখে?

৬. এটা চরম স্বার্থপরতা

কেউ হয়তো বলবে ডাকাতি একটি চরম স্বার্থপরতা। হ্যাঁ একথা মানি, ডাকাতি একটা স্বার্থপর কাজ। তবে আমি কী আমার স্বার্থ দেখব না? এটাতো আমাকে আমার বিলাসী জীবন উপভোগের উপায় করে দিয়েছে!

১. যুক্তি দ্বারা ডাকাতিকে মন্দ প্রমাণ করা যাবে না

অতঃপর ডাকাতিকে মন্দ কাজ হিসেবে প্রমাণ করার সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন ব্যর্থ ও অকার্যকর প্রমাণিত হলো। সকল যুক্তির বাণী একজন সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে কিন্তু আমার মতো একজন শক্তিধর প্রভাবশালী অপরাধীকে নয়। কোনো বিতর্কই কেবলমাত্র যুক্তির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কাজেই সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য অপরাধীর জয়জয়কার অবাক হবারও কিছু নেই।

একইভাবে প্রতারণা, নারীধর্ষণ ইত্যাদি আমার মতো ব্যক্তির জন্য ভালো কাজ হিসেবেই বিবেচিত হবে এবং যৌক্তিকতার দিক দিয়ে এমন কোন সূত্র নেই যা আমাকে বোঝাতে পারে যে, এসব কাজ মন্দ।

২. একজন শক্তিধর প্রভাবশালী অপরাধীকেও একজন মুসলমান বুঝিয়ে নমনীয় করতে পারে

এবার একটু ভিন্নভাবে দেখা যাক। ধরুন আপনি এ পৃথিবীর একজন শক্তিশালী প্রভাবশালী অপরাধী। পুলিশ আপনার করতলে। এমনকি দু'চারজন মন্ত্রী-মিনিষ্টারও হাতের মুঠোয়। বহু চামচা রয়েছে আপনাকে সারাক্ষণ পাহারা দেবার জন্য। আর আমি একজন মুসলমান যে আপনাকে বোঝাতে সক্ষম হবো–ডাকাতি, ধর্ষণ, প্রতারণা ইত্যাদি জঘন্য কাজ। এখন আমি যদি পূর্বের যুক্তিতর্ক তার সামনে উপস্থাপন করি তবে সে একইভাবে উত্তর দেবে যেমনটা আগে সে দিয়েছে। একথাও সঠিক যে, অপরাধী অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং তার সমস্ত যুক্তি যথাযথ। কিন্তু তা শুধুমাত্র তখনি সত্য ও সঠিক যখন সে একজন শক্তি ও প্রভাবশালী অপরাধী।

৩. প্রতিটি লোক ন্যায় ও সুবিচারের আকাঙ্ক্ষি ঃ এমনকি এ সুবিচার যদি সে অন্যের জন্য না চায়- নিজের জন্য তা অবশ্যই আশা করবে। শক্তি ও প্রভাবের বদৌলতে অনেকে নেশা করে আর অন্যদের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়। এই একই লোক ফোঁস করে উঠবে যদি তাদের প্রতি কোনো অবিচার হয়। এধরনের লোকদের অপরের দুঃখ-কষ্টের প্রতি কোনো অনুভূতি না থাকার কারণে তারা ক্ষমতা ও প্রভাবের পূজা করে। এই ক্ষমতা ও প্রভাবের দরুন তারা যে শুধু অন্যের ওপরে অবিচার করছে তা-ই নয় বরং অন্যে যাতে তাদের প্রতি অনুরূপ আচরণ না করতে পারে তার প্রতিরোধও করছে।

৪. আল্লাহ মহাশক্তিমান এবং ন্যায়পরায়ণ ঃ

একজন মুসলিম হিসেবে আমি অপরাধিকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্পর্কে স্মরণ করাব যে, এই আল্লাহ তোমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তির অধিকারী এবং সেই সঙ্গে তিনি ন্যায়পরায়ণও। কুরআন বলছে ঃ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিচার করেন না (কারো প্রতি) বিন্দু পরিমাণ।

৫. আল্লাহ্ আমাকে কেন শাস্তি দিচ্ছেন না?

অপরাধী, যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানী হওয়ার সুবাদে কুরআনের বিজ্ঞান ও যুক্তিসঙ্গত দলিল প্রমানাদি উপস্থাপনের পরে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার কোনো আপত্তি থাকল না। এখন সে হয়তো প্রশ্ন করে বসবে যে, আল্লাহ মহাশক্তিমান এবং সুবিচারক হওয়া সত্ত্বেও তাকে কেন শাস্তি দিচ্ছেন না?

৬. যারা অবিচার করে তাদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন ঃ

প্রতিটি মানুষ, যে কোনো অবিচারের শিকার হয়েছে– তা আর্থিকভাবে হোক অথবা সামাজিকভাবে – ভুক্তভোগী প্রতিটি মানুষ চাইবে অত্যাচারীর শাস্তি হোক। প্রতিটি সাধারণ মানুষের আন্তরিক কামনা; ডাকাত, ধর্ষককে সমুচিত শিক্ষা দেয়া হোক। যদিও অসংখ্য অপরাধী ধরাও পড়ছে, শাস্তিও পাচ্ছে কিন্তু তারপরও কতিপয় শক্তিধর লোক মুক্ত সমাজে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে নিজের স্ফূর্তিময় বিলাসী জীবন যাপন করছে। অতঃপর যদি এধরনের লোকদের ওপর অবিচার আপতিত হয় এমন একজনের দ্বারা যে তার চাইতেও বেশি শক্তিধর। তখন এই অপরাধী ও চাইবে যে, তার প্রতি অবিচারকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক।

৭. এ জীবন পরকালীন চির স্থায়ী জীবনের জন্য পরীক্ষার অবকাশ মাত্র

পরকালের অনন্ত জীবনে সফলতার সঙ্গে প্রবেশের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য জীবনটা একটা পরীক্ষা। কুরআন বলছেঃ

اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ط وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ ـ

অর্থ, যিনি সৃষ্টি করেছেন– মৃত্যু ও জীবন, যেন তিনি (তাদ্বারা) পরীক্ষা করে দেখতে পারেন– কাজে-কর্মে তোমাদের মধ্যে কে সর্বোত্তম। তিনি তো মহাশক্তিমান ক্ষমা দানকারী। -সূরা আল-মুলকঃ ২

৮. চূড়ান্ত ফয়সালা শেষ বিচার দিনে

অর্থঃ প্রতিটি প্রাণকেই মৃত্যু-যন্ত্রনা ভোগ করতেই হবে এবং অবশ্যই পুরোপুরিভাবে বুঝে দেয়া হবে তাদের পাওনা কেয়ামতের দিন। তখন যে রক্ষা পেলো আগুন থেকে এবং প্রবেশ করতে দেয়া হলো জান্নাতে চূড়ান্তভাবে সে-ই লাভ করলো মহা সফলতা। আর এই পৃথিবীর জীবন কিছুই নয়, শুধু (ক্ষণিকের জন্য) মায়া ও মোহময় আয়োজন। -সূরা আলে-ইমরানঃ ১৮৫

ভালো মন্দের সবকিছু পরিমাপ করে দেখানো হবে শেষ বিচার দিনে। একজন মানুষের মৃত্যুর পরে তাকে পুর্ণজীবিত করা হবে সর্বকালের সকল মানুষের সঙ্গে শেষ বিচার দিনে। এটা খুবই সম্ভব যে, একজন মানুষ তার প্রাপ্য শাস্তির কিছু অংশ এই পৃথিবীতে পেলো। আর চূড়ান্ত শাস্তি অথবা পুরস্কার সে পাবে পরকালে। মহান আল্লাহ একজন ডাকাত বা একজন ধর্ষককে পৃথিবীতে কোনো শাস্তি নাও দিতে পারেন, কিন্তু শেষ বিচার দিনে তাকে অবশ্যই সকল কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে এবং সেই চির স্থায়ী পরকালে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৯. মানুষের আইন কী হিটলারকে শাস্তি দিতে পারে

এ্যডলফ 'হিটলার' তার ভয়ঙ্কর ত্রাসের শাসনামলে ৬০ লক্ষ ইহুদীকে পুড়িয়ে মেরেছে। এখন পুলিশ যদি তাকে গ্রেফতার করতো তাহলে মানুষের আইন অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গতভাবে তাকে কী সাজা বা শাস্তি দিত? সর্বোচ্চ শাস্তি তারা হয়তো সেই গ্যাস চেম্বারে হিটলারকে ঢুকিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তাতে তো শুধুমাত্র একজন ইহুদী হত্যার প্রতিশোধ তথা শাস্তি হতো! বাকি যে ৫৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯শ ৯৯ জন ইহুদী– তাদের হত্যার প্রতিশোধ কীভাবে হবে?

১০. একমাত্র আল্লাহ্ পারেন হিটলারকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ষাট লক্ষ বারের চাইতেও বেশি বার জ্বালাতে।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেনঃ "যারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে খুব শিগ্রই আমরা তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়া যখন পুড়ে গলে যাবে তখন তার পরিবর্তে আমরা তাদেরকে নতুন চামড়া দিয়ে দেব। যেন তারা আযাবের স্বাদ বুঝতে পারে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিমান মহাজ্ঞানী। (৪ ঃ ৫৬)

পরকালের অনন্ত জীবনে হিটলারকে একমাত্র ন্যায়বিচারক আল্লাহই পারেন ষাট লক্ষ বার পুড়ে মরার স্বাদ কেমন তা বুঝিয়ে দিতে।

১১. মানবীয় মূল্যবোধ–পরকালের নিশ্চিত আস্থা ছাড়া কখনো কোনো মূল্য রাখে না।

যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করা বাস্তব সত্য এই যে, পরকালের প্রতি যার দৃঢ় আস্থা নেই, মানবীয় মুল্যবোধ এবং ভালো ও মন্দ কর্মের পরিণতি এমন ব্যক্তির কাছে প্রমাণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব– এখানে যে অবিচার, অত্যাচার, জুলুম করেই যাচ্ছে। বিশেষভাবে যদি সে ক্ষমতাবান হয়।

মুসলমানরা এত দলে বিভক্ত কেন?

প্রশ্ন ঃ মুসলমানরা যেখানে এক এবং একই কুরআনের অনুসারী। তাহলে মুসলমানদের মধ্যে এতে বিভক্তি এবং চিন্তাধারার এত বিভিন্নতা কেন?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ক. মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ থাকা উচিত ঃ

এটা অনস্বীকার্য ও দুঃখজনক বিষয় যে, আজকের মুসলমানরা নিজেদের মধ্যেই অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। আর তার চেয়ে বেশি দুঃখজনক হলো এই বিভক্তি স্বয়ং ইসলামে আদৌ স্বীকৃত নয়। ইসলাম বলে তার অনুসারীদের মধ্যে ঐক্য এবং একতা লালন করতে।

কুরআন বলছে ঃ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا .

অর্থঃ এবং আঁকড়ে ধরো দৃঢ়তার সঙ্গে সবাই মিলে আল্লাহ্র রজ্জুকে (যা তিনি ঝুলিয়ে রেখেছেন তোমাদের জন্য কুরআনের আকারে) এবং নিজেরা বিভক্ত হয়ে যেও না। (৩ঃ ১০৩)

এ আয়াতে যে রজ্জুর কথা বলা হয়েছে তা কোন রজ্জু? মহাবিজ্ঞান আল-কুরআন সে আল্লাহ্র রজ্জু যা সমস্ত মুসলমানের সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরা উচিত। এ আয়াতেই ঐক্যের ব্যাপারে দ্বিগুন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সবাই মিলে শক্ত করে ধরো এ কথা বলার সাথে সাথে বলা হয়েছে বিভক্ত হয়ো না।

কুরআন আরো বলছে ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ـ

অর্থঃ আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য করো রাসূলের। (৪ঃ৫৯)

সকল মুসলমানের কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ অনুসরণ করা কর্তব্য এবং নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হওয়া অনুচিত।

খ. ফের্কাবাজী ও বিভক্তি ইসলামে নিষিদ্ধ ঃ কুরআন বলছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ ط اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ـ

অর্থঃ যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সঙ্গে তোমার এতটুকু সম্পর্ক নেই। তাদের এসব ব্যাপার আল্লাহর কাছে ন্যস্ত। অবশেষে তিনি তাদেরকে বলে দেবেন সেই সকল সম্পর্কে যেসব কর্ম তারা করছিল। -সূরা আনআমঃ ১৫৯

এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, ঐ সমস্ত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে যারা নিজেদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু (দুঃখের বিষয়) কেউ যখন কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে- তুমি কে? সাধারণ জবাব হলো, আমি একজন সুন্নী অথবা আমি শিয়া। অনেকেই নিজেদেরকে (একধাপ এগিয়ে) হানাফী অথবা শা'ফী অথবা মালেকী অথবা হাম্বলী ইত্যাদি হিসেবে পরিচিত হতে গর্ববোধ করেন। কেউ আবার দেওবন্দী। কেউ ব্রেলোভী বলে থাকেন।

গ. আমাদের রাসূল (স) শুধু একজন 'মুসলিম' ছিলেন ঃ উপরোক্ত একজন মুসলমানকে কেউ যদি প্রশ্ন করে আমাদের প্রিয় নবী (স) কী ছিলেন? তিনি কী একজন হানাফী অথবা শাফী অথবা হাম্বলী ছিলেন? না! তিনি ছিলেন একজন মুসলিম। তাঁর পূর্বে আগত আল্লাহ্‌র সমস্ত নবী ও রাসূলগণের মতো।

যেমন- সূরা নিসা ৫২ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- ঈসা (আ) ছিলেন একজন মুসলিম। ৬৭ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- ইব্রাহীম না ইহুদী ছিল না খ্রীষ্টান, সে ছিল একজন মুসলমান।

ঘ. কুরআন বলছে নিজেদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় দাওঃ কউ পরিচয় জানতে চাইলে তার বলা উচিত আমি একজন মুসলমান বা মুসলিম- না হানাফী না শাফী।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থঃ আর কে হতে পারে বক্তব্যে তার চেয়ে উত্তম? যে (মানুষকে) আল্লাহ্‌র পথে আহ্বান করে আর যাবতীয় জীবন-কর্ম যেভাবে আল্লাহ করতে বলেছেন সেভাবে করে এবং বলে, আমি তো মুসলিম (আল্লাহতে আত্মসর্ম্পনকারীদের একজন)। (৪১ঃ৩৩)

অন্যত্র, কুরআন বলে- "আমি তাদেরই একজন যারা আল্লাহতে সমর্পিত। অন্য কথায়- বলো, আমি একজন মুসলিম।

২. রাসূল (স) অমুসলিম রাজা বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। সেই সমস্ত চিঠিতে তিনি সূরা আলে-ইমরানের এই আয়াত উল্লেখ করেছিলেন।

فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ۔

অর্থঃ তাহলে বলে দিন (ওদেরকে) তোমরা সাক্ষী থাকো একথার যে আমরা সর্বান্তকরণে আল্লাহতে আত্মসর্ম্পনকারী 'মুসলিম'। (৩ঃ ৬৪)

৬. ইসলামের মহান ইমামগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান ঃ ইসলামের ইতিহাসে মহান ইমাম ও আলেমগণের প্রতি আমাদের সম্মানবোধ আন্তরিক হতে হবে। তাঁদের জীবন-নিংড়ানো জ্ঞান সাধনা মুসলিম জাতিকে জ্ঞান সম্পদে সম্পদশালী করেছে। আল্লাহ্র দরবারে নিঃসন্দেহে তাঁরা পুরস্কৃত হবেন। সাধারণের মধ্যে কেউ যদি বিশেষ কোনো ইমামের রীতি পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তা অবশ্যই দোষের কিছু নয়। কিন্তু (জাতীয়) পরিচয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের কারো নাম জড়িয়ে পরিচয় দেয়া এক রকম সংকীর্ণতার প্রকাশ। যেমনটা করতে তাঁরা কেউ বলে যাননি। নবী রাসূলগণের ন্যায় তাঁরাও ছিলেন শুধুমাত্র আল্লাহতে সমর্পিত 'মুসলিম'। কাজেই তাঁদের কারো অনুসারী হলেই পরিচয় পরিবর্তন হয় না। মুসলমানদের পরিচয় একটাই– তারা মুসলিম।

অনেকেই হয়তো এক্ষেত্রে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংকীর্ণ মানসিকতাকে চাপা দেবার নিমিত্তে সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত ৪৫৭৯ নং হাদীস খানি নিয়ে তর্ক জুড়ে দিবেন। যা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "আমার উম্মত ৭৩টি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে।" 'কিন্তু এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর উম্মতের অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সমস্ত বিকৃতি দেখা দেবে তারই অন্যতম একটি আগামবার্তা বহন করছে। রাসূল (স) তো একথা বলেননি যে মুসলমানরা এভাবে ফের্কায়ে ফের্কায় ভাগ হয়ে যেতে হবে।

আল কুরআন যেখানে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে কোনো ধরনের বিভক্তির সৃষ্টি করা যাবে না। অতএব যারা কুরআন ও শুদ্ধ হাদীসসমূহের একনিষ্ঠ অনুসারী এবং কোনো ধরনের বিচ্ছিন্নতার কারণ না হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে তারাই সঠিক পথে রয়েছেন।

তিরমীযি শরিফের ১৭১ নং হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেনঃ আমার উম্মত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি ছাড়া বাকি সব জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই শুদ্ধ (সঠিক)! দল কোনটি হবে? রাসূল (স) বললেন, "যাদের কাছে আমি এবং আমার সঙ্গী সাথীরা অনুস্মরণীয় হবো"।

"আনুগত্য করো আল্লাহ্র এবং আনুগত্য করো রাসূলের" কুরআনের বহু স্থানে এই একটি কথা মুসলমানদের মনের ভেতর স্থায়ীভাবে বসিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই একজন মুসলমানের অনুস্মরণীয় আদর্শ হচ্ছে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস। এরপর এ দুয়ের নির্দেশনা সমূহকে অনুশীলনীর পদ্ধতি হিসেবে সে যদি বিশেষ কোন আলেমকে অনুসরণ করতে চায় তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু তা যদি আবার কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে স্বয়ং কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধে চলে যায় তাহলে সে যত বড় বিশেষজ্ঞ আলেমই হোক না কেন– দুই পয়সা মূল্য রাখেন না।

প্রতিটি মুসলিম যদি তার সামর্থ অনুযায়ী কুরআন বুঝে পড়ার অনুশীলন করে এবং সেখান থেকে পাওয়া মূলনীতিসমূহ স্বয়ং রাসূল (স)-এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রয়োগের চেষ্টা করে তাহলে ইনশাল্লাহ একদিন এই বিভক্তি দূর হয়ে যাবে এবং আমরা ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী এক 'উম্মাহ' হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হব।

সব ধর্ম তো ভালো ও কল্যাণের শিক্ষা দেয় তবে শুধু ইসলামের অনুসরণ করতে হবে কেন?

প্রশ্ন ঃ সকল ধর্মই মূলত তার অনুসারীদেরকে ভালো কাজ করতে শিক্ষা দেয়। তা হলে শুধুমাত্র ইসলামকে অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে কেন? যে কোনো একটি ধর্ম অনুসরণ করলে সমস্যা কোথায়?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ক. অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের মৌলিক পার্থক্য ঃ

মূলত প্রত্যেক ধর্মই মানুষকে মন্দ ছেড়ে ভালো হবার পরামর্শ দেয়। কিন্তু ইসলামের পরিধি আরো ব্যাপক। ইসলাম আমাদেরকে ন্যায়-পরায়ণতা লাভের প্রকৃতিসম্মত পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ করে। এবং বাতলিয়ে দেয় কিভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে যাবতীয় মন্দ নির্মূল করা যায়। ইসলাম মানুষের স্বভাব প্রকৃতি ও সমাজের চিন্তাচেতনা ও রুচি অভিরুচিকে বিবেচনায় রাখে। ইসলাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার দেয়া মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতির দিক নির্দেশিকা। এ কারণে ইসলামকে 'দ্বীনুল ফিৎরাহ' বা মানুষের প্রকৃতিসম্মত জীবনব্যবস্থাও বলা হয়েছে।

খ. যেমন ইসলামে আমাদেরকে চুরি, ডাকাতি পরিহার করার পাশাপাশি এ-ও নির্দেশ দেয় যে, কেমন করে সমাজ থেকে এ অন্যায় প্রবণতা নির্মূল করা যাবে।

১. বড় বড় সকল ধর্মই শিক্ষা দেয় চুরি-ডাকাতি মন্দ ও গর্হিত কাজ। ইসলামের শিক্ষাও তাই। অন্য ধর্মের সঙ্গে ইসলামের পার্থক্য কোথায়? পার্থক্যটা হচ্ছে চুরি ডাকাতি মন্দ কাজ এ শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি ইসলাম এমন একটি সামাজিক অবকাঠামো তৈরির বাস্তব পদ্ধতি নির্দেশ করে– যে সমাজে চুরি ডাকাতির প্রয়োজনই পড়বে না।

২. মানুষের অভাব-অনটন দূর করতে ইসলাম যাকাতের বিধান দিয়েছে।

ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে, যাকাত বাধ্যতামূলক এমন ব্যক্তির জন্য যার নিসাব পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকে। অর্থাৎ বাৎসরিক আয় ব্যয়ের পরে ৮৫ গ্রাম সোনা বা এর সমমূল্যের নগদ অর্থ অথবা অন্যান্য মালপত্র উদ্বৃত্ত থাকবে। ২. ৫% বা শতকরা আড়াই টাকা প্রতি চন্দ্র বৎসরের শেষে ঈদুল ফিতরের পূর্বে) অভাবগ্রস্থদের দিয়ে দিতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি বিত্তবান ব্যক্তি যদি এই যাকাত আদায় করে তাহলে দারিদ্রতা বলতে পৃথিবীতে কিছু বাকি থাকবে না। তখন ভিক্ষা দিতেও একজন ভিখারীকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

৩. চুরি ডাকাতির শাস্তি হাত কর্তন ঃ

চোর ডাকাত, প্রমাণিত হলে ইসলাম তার হাত কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছে কুরআন বলছে ঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

অর্থ, চোর অথবা চোরণী, তোমরা তাদের হাত কেটে দাও। এটাই শাস্তি যে অপকর্ম তারা করেছে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহর তরফ থেকে। আর আল্লাহ মহাশক্তিমান জ্ঞানপূর্ণ। -সূরা মায়েদাহঃ ৩৮

অনেক অমুসলিম বলে ফেলবেন, এই বিংশ শতাব্দীতে কারো হাত কেটে ফেলা? এ-তো মধ্য যুগীয় বর্বরদের কাজ। ইসলাম তো তাহলে এক নিষ্ঠুর ধর্ম।

৪. ইসলামী বিধিবিধান প্রতিষ্ঠিত হলে তার সুফল হাতে হাতে পাওয়া যায় ঃ

আমেরিকা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে চুরি, ডাকাতি ও বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রেও তার রয়েছে সর্বোচ্চ রেকর্ড। এই আমেরিকায় যদি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়– একদিকে

প্রতিটি সামর্থবান ব্যক্তি রীতিমতো যাকাত প্রদান করছে অপরদিকে চোর প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হাত কেটে ফেলা বাস্তবায়ন হচ্ছে। তাহলে আমেরিকায় চুরি, ডাকাতির বর্তমান প্রবণতা বাড়বে, না একই রকম থাকবে, নাকি একেবারে কমে যাবে? সঙ্গতভাবেই তা কমে যাবে। তদুপরি এই ধরনের কঠিন আইন থাকলে অনেক জাতী চোরও নিজেকে এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। অর্থাৎ চুরি ডাকাতি বিলুপ্ত হবে।

একথা মানতেই হবে যে, সারা পৃথিবীতে চুরি-ডাকাতি বর্তমানে যে পরিমাণে বেড়েছে হাত কাটা আইন জারি হলে লক্ষ লক্ষ লোক এমন দেখা যাবে যাদের হাত কাটা। বিষয় হলো– যে মুহূর্তে এই আইন জারির ঘোষণা করা হবে তার পরের মুহূর্ত থেকেই এ প্রবণতা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে হ্রাস থাকবে। পেশাদারী চোরও এ পথে পা বাড়ানোর পূর্বে একবার অন্তত ভেবে নেবে– ধরা পড়লে তার পরিণতি কী হবে। শাস্তির ভয়াবহতাই চোরের ইচ্ছাকে দমন করার জন্য যথেষ্ট। তখন নিতান্ত দুরাত্মা ও দুর্ভাগা ব্যতীত এ কাজ আর কেউ করবে না। সামান্য কয়েকটি লোকের হয়তো হাত টাকা যাবে কিন্তু কোটি কোটি মানুষ অর্জন করবে নিরাপত্তা, শান্তি এবং সর্বস্ব খোয়ানোর ভয় থেকে মুক্তি।

ইসলামী বিধান বাস্তবধর্মী এবং প্রত্যক্ষভাবে ফলদায়ক

গ. যেমনঃ ইসলাম হারাম করেছে নারী ধর্ষণ ও উৎপীড়ন। সাথে সাথে বাস্তবায়ন করতে বলেছে নারী ও পুরুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা কবজ হিজাব বা পর্দা এবং ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

১. ধর্ষণ ও উৎপীড়নের শেকড় নির্মূল করার পরামর্শ দিয়েছে ইসলাম ঃ

পৃথিবীর সকল ধর্ম নারী ধর্ষণ ও উৎপীড়ন জঘন্য অপরাধ বলে ঘোষণা করে। ইসলামের শিক্ষাও তাই। তাহলে পার্থক্য কী ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের? পার্থক্যের বিষয়টা হলো ইসলাম শুধুমাত্র নারী মর্যাদার বক্তব্য দেয় না বা ধর্ষণ ও উৎপীড়নকে অপরাধ হিসেবে ঘৃণার সাথে পরিত্যাগ করতেই বলে না। পাশাপাশি সুস্পষ্ট নির্দেশনাও দেয় কিভাবে সমাজ থেকে এই জঘন্য অপরাধ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

পুরুষের পর্দা

হিজাব বা পর্দা ইসলামের একটি বিধান। কুরআন প্রথম উল্লেখ করেছে পুরুষের পর্দা। এরপরে নারীর জন্য পর্দার বিধান।

অর্থঃ (হে রাসূল!) মো'মেন পুরুষদের বলুনঃ তারা যেন নিজেদের চোখকে সংযত করে চলে। এবং নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহ হেফাজত করে। এটা তাদের আরো পবিত্র হয়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত কার্যকর। (তাদের চরিত্র নির্মাণের জন্য) যা কিছুই তারা করে অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ সে সব কিছু সম্পর্কেই জ্ঞাত –সূরা নূরঃ ৩০

যে মুহূর্তে একটি পুরুষ একজন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলো যদি কোনো রকম অশ্লীল চিন্তা মাথায় এসে যায় এই ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি নামিয়ে নেবে।

নারীর পর্দা

কুরআন নারীর পর্দা সম্পর্কে ইরশাদ করছেঃ

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ ـ

অর্থঃ আর (হে নবী) মো'মেন মহিলাদের বলুন! তারা যেন নিজেদের চোখ অবনত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহের যথাযথ হেফাযত করে। আর যেন তাদের রূপ-সৌন্দর্য ও অলংকারের প্রদর্শনী না করে। তবে এ সবের মধ্যে যা অনিবার্যভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। আর তারা যেন তাদের ওড়না তাদের বুকের ওপর ঝুলিয়ে দেয়। আর তারা প্রকাশ করবে না তাঁদের রূপ-সৌন্দর্য তাদের স্বামী অথবা তাদের পিতা অথবা তাদের স্বামীদের পিতা (শ্বশুর) অথবা তাদের পুত্র ব্যতীত। -সূরা নূরঃ ৩১

নারীর জন্য পর্দার পরিধি হলো তার সম্পূর্ণ দেহ আবৃত বা ঢেকে থাকতে হবে ঢিলেঢালা কাপড়ে। শুধু কব্জী পর্যন্ত হাত এবং মুখমণ্ডল খোলা থাকতে পারে যদি তারা চায় তা না হলে তাও ঢেকে নিতে পারে। কতিপয় ইসলামী বিশেষজ্ঞ মুখমণ্ডল ঢাকারও পরামর্শ দেন।

হিজাব উৎপীড়ন থেকে হেফাযত করে

নারীকে কেন মহান আল্লাহ হিজাব ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন কুরআনে তা এভাবে বলা হয়েছে।

অর্থঃ হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ ও কন্যাগণ এবং ঈমানদার নারীদেরকে বলে দিন তারা যেন ঝুলে দেয় নিজেদের ওপর তাদের বড় চাদর জাতীয় কিছু (যখন বাইরে যাবে)। এটা তাদের পরিচিতির জন্য নূন্যতম তাহলে তারা আর উৎপীড়িত হবে না। আর আল্লাহ তো ক্ষমা দানকারী দয়াময় -সূরা আহযাবঃ ৫৯

কুরআন বলে, নারীকে এই কারণে পর্দা করতে বলা হয়েছে যেন তারা রুচিশীল মহিলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এটা তাদেরকে উৎপীড়ন থেকে হেফাযত করবে।

নারী ধর্ষণের সর্বোচ্চ রেকর্ড

১৯৯০ সালে আমেরিকায় এফ, বি, আই, এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১,০২,৫৫৫ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ সংক্রান্ত আনুমানিক সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ ঘটনার অভিযোগ করা হয়। তাহলে পূর্ণ হিসাব বের করতে হলে ৬. ২৫ দিয়ে গুন করতে হবে। ফল দাঁড়ালো ৬,৪০,৯৬৮ এ সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ করলে প্রতিদিন ১৭৫৬টি ধর্ষনের ঘটনা আমেরিকায় ঘটছে।

আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব জ্যাস্টিস এর ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সারভে ব্যুরো অব জাস্টিস এর প্রকাশিত রিপোর্টে ১৯৯৬ সালে ৩, ০৭০০০ ধর্ষনের অভিযোগ রেকর্ডভুক্ত। তাতে বলা হয়েছে সংঘটিত ঘটনার সর্বোচ্চ ৩১ শতাংশ অভিযোগ দায়ের করা হয়, তাহলে ৩.৭০০০০× ৩.২২৬ = ৯.৯০৩২২ টি ধষর্নের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদিন ২৭১৩ অর্থাৎ প্রতি ৩২ সেকেন্ডে পৃথিবীর সভ্যতম দেশে একজন নারী ধর্ষিত হয় ১৯৯০ থেকে ১৯৯৬ এর এই পার্থক্য লক্ষ্য করার মতো। মনে হয় আমেরিকার ধর্ষকরা দিন দিন আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

এফ, বি, আই এর সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে ঘটনার মাত্র ১০ শতাংশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। অর্থাৎ সংঘটিত ঘটনার মাত্র ১.৬% ভাগ। এদিকে অভিযুক্তদের ৫০ শতাংশ বিচারের আগেই ছাড়া পায়। তার মানে ০.৮% ভাগ ধর্ষক বিচারের সম্মুখীন হয়। বিশ্লেষণ মতে কোনো ধর্ষক ১২৫ জন নারীকে ধর্ষণ করলে এর মধ্যে তার ধরা পড়ে শাস্তি ভোগের সম্ভাবনা মাত্র একবার।

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে ০.৮% শতাংশের যারা বিচারের সম্মুখীন হয় তাদের ৫০% শতাংশই এক বছরের কম সময় কারা ভোগ করে। যদিও আমেরিকার আইনে তার বিধান রয়েছে ৭ বছরের। ধর্ষণের দায়ে প্রথমবার ধরা পড়লে বিচারকরা তাদের প্রতি কোমল দণ্ডের রায় দেন। ভেবে দেখার মতো বিষয় বটে! অদ্ভুত কাণ্ড একজন ধর্ষক ১২৫ বার ধর্ষণ করলে, গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা মাত্র একবার। গ্রেপ্তার হলে শাস্তির সম্ভাবনা মাত্র কয়েক মাস।

মানবীয় সমস্যায় ইসলামের সমাধান বাস্তবমুখী ঃ ইসলাম মানুষের কল্যাণে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন-যাপন পদ্ধতি। কেননা এর শিক্ষা অকার্যকর অবহেলার বস্তু নয় বরং মানুষের যাবতীয় সমস্যার নগদ ও বাস্তব সমাধান। ব্যক্তি ও সামাজিক সমস্যা, উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামে প্রত্যক্ষ ফলাফল অর্জন করে। ইসলাম একারনেও একমাত্র ও শ্রেষ্ঠতম জীবন পদ্ধতি যে, এটা বাস্তব সম্মত বিশ্বজনীন ধর্ম। কোনো জাতি অথবা জাতীয় জনগোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

ইসলামও আজকের মুসলিমদের মধ্যে আকাশ ও পাতালের পার্থক্য

প্রশ্ন ঃ ইসলাম যদি শ্রেষ্ঠতম ধর্ম হয় তবে অসংখ্য মুসলমান কেন এত অসৎ অবিশ্বস্ত এবং ঘৃণ্য অপরাধ জগতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ক. ১. ইসলাম যে শ্রেষ্ঠতম ধর্ম এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো সব পশ্চিমাদের দখলে– যারা ইসলামকে ভয় পায়। বিরামহীনভাবে ওদের প্রচার মাধ্যমগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং ছেপে যাচ্ছে। হয় তারা ভুল তথ্য পরিবেশন করছে অথবা ভুল তত্ত্ব দিচ্ছে অথবা ইসলামের আংশিক সত্যকে বড় করে তুলে ধরছে।

২. পৃথিবীর কোথাও কোনো বোমা বিষ্ফোরণ ঘটলে কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াই একগুয়িমিভাবে এর দায় মুসলিমদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে। এটাই হবে সংবাদের শিরোনাম। পরবর্তীতে যদি খোঁজা-খুঁজির মাধ্যমে জানা যায় যে, কোনো অমুসলিম এর জন্য দায়ি– তখন সে সংবাদটা আর উল্লেখ করার মতো কোনো খবর থাকবে না।

৩. পঞ্চাশ বছর বয়সী কোনো মসুলিম যদি ১৫ বছরের এক যুবতীকে তার সম্মতিক্রমেও শাদি করে তা চলে আসবে পত্রিকার প্রথম পাতায়। অথচ পঞ্চাশ বছরের কোনো অমুসলিম যদি ৬ বছরের কোনো মেয়েকে জোরপূর্বক ধর্ষণও করে তাহলে সেটা হয়ে যাবে ভেতরের পাতার অনুল্লেখযোগ্য সীমিত পরিসরে কোনো খবরের মতো। আমেরিকায় প্রতিদিন ২৭১৩ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, কিন্তু প্রচার মাধ্যমের জন্য এটা আদৌ কোনো খবর নয় বা চমক সৃষ্টি করে না। যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো নারী কোনো দুর্বৃত্তের দ্বারা ধর্ষিত হতে পারে– এটা বোধ হয় আমেরিকান নারীদের জন্য একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি।

খ. কালো ভেড়া সব পালেই থাকে ঃ এটা আমাদের ভালোভাবে জানা আছে যে, কিছু মুসলিম অসৎ, চরিত্রহীন ও প্রতারক ইত্যাদি। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো তা এমনভাবে প্রচার করে যে, এ ধরনের কাজ শুধু মুসলমানরাই করে। ঢালাওভাবে সকল মুসলিমদের চিহ্নিত করা সমাজের কলঙ্ক সব সমাজেই আছে।

গ. সামগ্রীকভাবে মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ ঃ মুসলিম সমাজে স্বল্প সংখ্যক কলঙ্কিত লোকজন থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর বুকে মুসলিমরাই শ্রেষ্ঠ সমাজের অধিকারী। সামগ্রীকভাবে সবচেয়ে "নেশামুক্ত" বৃহত্তর সমাজ। যৌথভাবে আমরা এমন একটি সমাজ যারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দান-দক্ষীণা করে থাকি। সামগ্রীকভাবে পৃথিবীতে এমন কোনো সমাজ নেই যেটা মুসলমানদের সঙ্গে একটু তুলনা করে দেখাতে পারে, যেখানে মানবীয় মর্যাদাবোধ, সংযম, সহনশীলতা, মূল্যবোধ এবং নীতি-নৈতিকতা ও স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদির প্রশ্ন ওঠে।

ঘ. একটি গাড়িকে তার ড্রাইভার দ্বারা বিচার করবেন না ঃ 'মার্সিড়িস' কোম্পানীর নতুন লেটেস্ট মডেলের একটি গাড়ী যদি আপনি যাচাই করে নিতে চান। এবং চালকের আসনে এমন একজন ব্যক্তিকে বসিয়ে

দিলেন যে ভালো ড্রাইভিং জানেনা। সে যদি ওটাকে নিয়ে দুম করে কোথাও লাগিয়ে দেয় তবে আপনি কাকে দোষী করবেন– গাড়িটিকে না ড্রাইভারকে? ড্রাইভারকে!

গাড়িটি সম্বন্ধে জানার জন্য আপনার উচিৎ ছিল ওটার ক্যাটালগ ও ম্যানুয়্যাল নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞের সামনে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নেয়া। চলার ধরন, গতি জ্বালানী খরচ, দুর্ঘটনা কবলিত হলে তা থেকে সুরক্ষার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ইত্যাদি। ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ীর আসল বা সঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। টাকার জোরে অনেক কোটিপতির দুলাল বিশ্বসেরা কোম্পানীর গাড়ি কিনে দু'দিনেই তার বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেয়।

একইভাবে জন্মসূত্রে পাওয়া 'ইসলাম' নিয়ে আজকের মুসলিমরা যা করছে তাতে তার বাহ্যিক চেহারা দুমড়ে মুচড়ে এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে যা দেখে নতুন কোনো ক্রেতা দু'পা অগ্রসর হলে দশ পা পিছিয়ে যান– এ বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে যিনি তার জীবনের পথটা সুন্দরভাবে পাড়ি দিয়ে সঠিক গন্তব্যে পৌছাতে চান তাকে তো সর্বোত্তম গাড়িটি তালাশ করে বের করতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে গাড়ি চেনার সঠিক পদ্ধতি, অর্থাৎ তার ম্যানুয়াল ও ক্যাটালগ ধরে বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে (সবকিছু) বিস্তারিত জেনে নিতে হবে।

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রচিত মানব-জীবন ম্যানুয়্যাল, 'আল কুরআন' এবং তাঁরই মনোনীত শ্রেষ্ঠতম নমুনা-মুহাম্মদ (স) নির্মিত ক্যাটালগ বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ ইসলামকে চেনা ও জানার একমাত্র মাধ্যম।

ঙ. ইসলামকে বিচার করতে হবে তার বাস্তবায়নকারী (প্রবর্তক) মুহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে। বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিকগণের পাশাপাশি কিছু অমুসলিম ঐতিহাসিক নিতান্ত সততার সাথে মানবেতিহাসের সেবা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম মাইকেল এইচ হার্ট তার রচিত 'দি হানড্রেড' গ্রন্থে মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ একশত ব্যক্তিত্বের একটি তালিকা করেছেন। তাতে শ্রেষ্ঠতম মানুষ হিসেবে এক নম্বর মুহাম্মদ (স)-এর নামটি লিখেছেন। থমাস কার্লাইল এবং লা-মার্টিন এর মতো ব্যক্তিত্বগণও তাদের রচনায় ইসলামের নবী মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি প্রভুত সম্মান পদর্শন করেছেন।

কাফের অর্থ যে প্রত্যাখ্যান করে

প্রশ্নঃ মুসলমানরা অমুসলিমদের কাফের বলে গালি দেয় কেন ?

ডা. জাকির নায়েক ঃ কাফের শব্দটি 'কুফর' মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ গোপন করা, আড়াল করা ও প্রত্যাখ্যান করা। ইসলামী পরিভাষায় কাফের বলা হয় সেই লোককে যে ইসলামের মহাসত্যকে গোপন করে, আড়াল করে বা প্রত্যাখ্যান করে। আর এমন ব্যক্তি, যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে বাংলায় অমুসলিম এবং ইংরেজীতে 'ননমুসলিম' বলা হয়।

যদি কোনো অমুসলিম তাকে অমুসলিম কিংবা কাফের বলাকে গালি মনে করেন তা হলে ইসলাম সম্বন্ধে 'তার ভুল ধারণা' বৈ এটাকে আর কিছুই বলা যায় না। তাই ইসলাম ও ইসলামী পরিভাষা সম্পর্কে ভালো করে জেনে নেবার জন্য তাকে ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীস থেকে জ্ঞান লাভ করতে হবে। তখন তিনি বুঝতে সক্ষম হবেন এটা গালি তো নয়ই বরং সঠিক পরিভাষা ব্যবহারের জন্য ইসলামকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারবেন না।